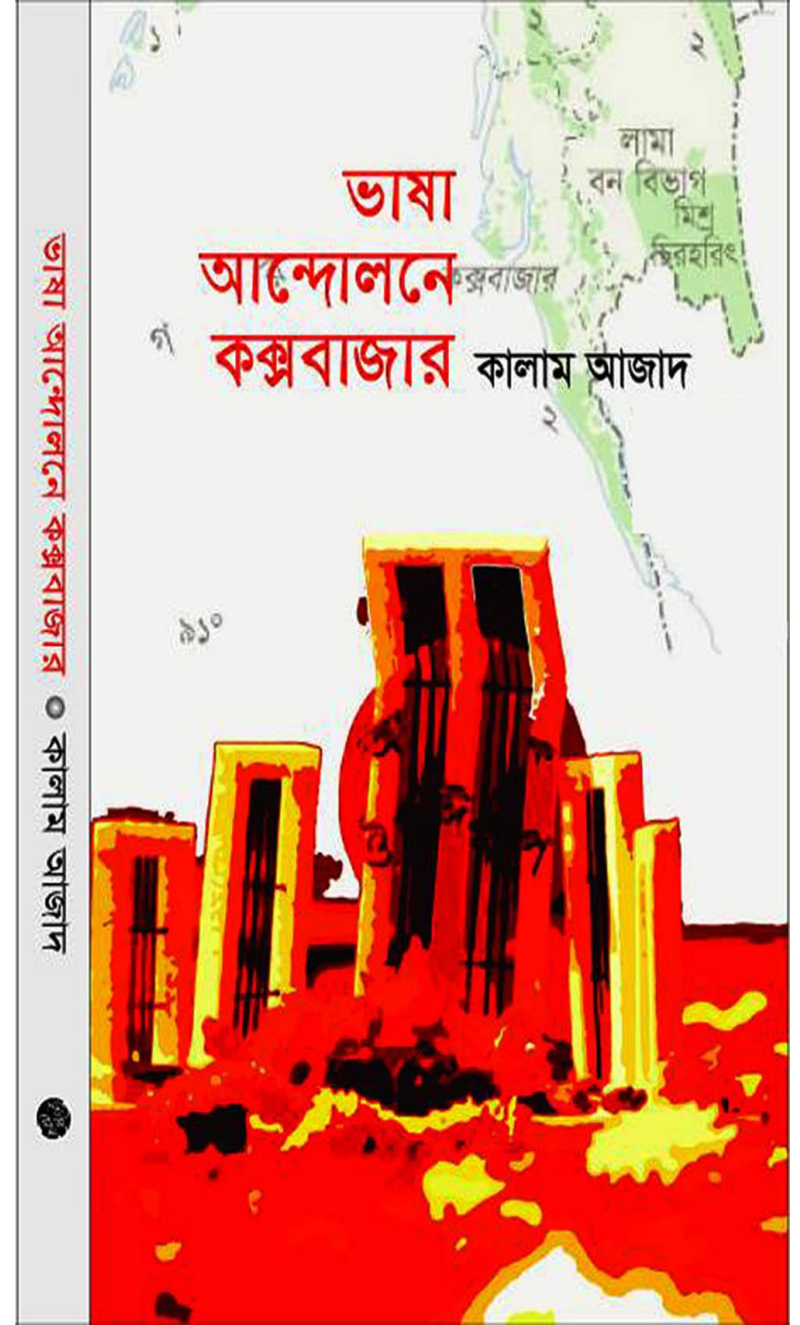




ভাষা আন্দোলনে কক্সবাজার

কালাম আজাদ

পৃষ্ঠপোষকতায়:

জেলা পরিষদ, কক্সবাজার।

কৃতজ্ঞতায়:

মোশতাক আহমদ চৌধুরী, প্রশাসক, কক্সবাজার জেলা পরিষদ,

আবদুল মান্নান মেহেদী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কক্সবাজার জেলা পরিষদ।

ভাষা আন্দোলনে কক্সবাজার কালাম আজাদ

প্রকাশক:
আলী প্রয়াস



৪০, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম। স্থায়ী কার্যালয়: লেন্সুরবিল রোড, টেকনাফ, কক্সবাজার। প্রথম প্রকাশ: একুশে
বইমেলা ২০১৫, গ্রন্থস্বত্ব: লেখক, প্রচ্ছদ: নির্ঝর নৈশভাষ্য, মুদ্রণ: ভিক্টোরিয়া প্রেস, আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম।
প্রকাশযোগ: ০১৮১৯৪২২৬১৮, E-mail: thirdeyecox@gmail.com

পরিবেশক: পড়ুয়া, গদ্যপদ্য-ঢাকা। বাতিঘর, চট্টগ্রাম, রক্ষিত পুস্তকালয়, রক্ষিত মার্কেট-কক্সবাজার।

**Bhasha Anndulone Cox'sbazar (Cox'sbazar in the annals of Literary
Movement) by Kalam Azad, Published by: Tritio Chokh, Permanent
Address:** Lengurbill Road, Teknaf, Cox's Bazar, Bangladesh, **First Edition:**
Ekushe Book Fair 2015, **Cover Design:** Nirzhar Noishabdia, **Print:** Victoria Press,
Anderkilla, Chittagong—4000. **Price: 200 BDT only, US\$ 10, Phone:** +88 01819
422 618, ISBN: 978 984 91506 4 0

মূল্য—২০০ টাকা

উৎসর্গ

বায়ান্নের ভাষা শহীদ
কক্সবাজারের ভাষা সংগ্রামী মানুষ
ও
যাদের জন্মদানে আমি অক্ষরজীবী

ভূমিকা

হাজার বছর ধরে বিকশিত বাঙালি জাতি নানামাত্রিক শাসন-শোষণে পিষ্ট হয়েছে দীর্ঘকাল। কিন্তু একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলার মতো চেতনা, ঐক্য ও অবস্থা সে সময়ে তৈরি হয়নি। বলশালী রাজরাজড়াদের দখলী সত্ত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালির রাজনৈতিক সত্ত্ব দ্রুত বিকশিত হতে আরম্ভ করে। শোষণ ও লুণ্ঠক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই গিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক সত্ত্ব পুষ্ট ও পোক্ত হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯০ বছরের উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তান-ভারত নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু তা ছিল বাঙালিদের জন্য স্বাধীনতার মরীচিকা মাত্র। ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত পাওয়ার পরই শুরু হয় পাকিস্তানি শাসন, শোষণ ও নির্যাতন। সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার মতো দ্বিজাতিতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উষালগ্নেই বাঙালির স্বপ্নভঙ্গের সূচনা হয় রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। সংখ্যালঘুর মুখের বুলি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার নামে বাঙালির স্বকীয়তা ও স্বাভাবিকবোধের কবর রচনার যে ষড়যন্ত্র তা বুকের রক্তে প্রতিরোধ করে বাংলা মায়ের সন্তানরা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এ সাফল্যের উদ্ভাসিত জাতি সকল বঞ্চনা ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তীব্র প্রতিরোধে। এ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বীজ বপন করা হয় স্বাধীনতার।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনকে প্রধানত দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫১ এবং দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায় বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন। এই দুই পর্বেই কল্পবাজারের মাতৃভাষা-প্রিয় শিক্ষার্থী ও জনগণ আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে ঢাকায় নেতৃত্ব দিয়েছেন তৎকালীন ডাকসু ভিপি কল্পবাজারের সন্তান ফরিদ আহমদ (একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষালম্বন করায় রাজনৈতিকভাবে ঘৃণিত ও নিহত হন) ও চট্টগ্রামে ছাত্র ফেডারেশন কর্মী সাহিত্যিক শহিদ সাবের। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে যেভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে কল্পবাজার তা থেকে অনেক দূরে কিংবা ওই সময়ে কল্পবাজার থেকে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ায় কিংবা জাতীয়/আন্তর্জাতিক পত্রিকায় কোনো সাংবাদিক কল্পবাজারে কর্মরত না থাকায় তেমন ফলাও করে সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কিংবা সমকালীন বৈশ্বিক গণমাধ্যমেও এ সম্পর্কিত তথ্য অনুপস্থিত। তবে বিভিন্ন জনের স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কিত যথাক্রমে তথ্য পাওয়া যায়। তাই এ গ্রন্থ প্রণয়নে প্রধানত কল্পবাজারের নেতৃস্থানীয় ভাষা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে সাক্ষাৎকার বা স্মৃতিকথার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অন্যান্য উপাদানের অভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভাষা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিকথা বা সাক্ষাৎকারসমূহ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা যেমন তথ্য বিকৃতি, আবেগদৃষ্ট উপস্থাপনা, কথনের অতিরঞ্জন উপস্থাপনা প্রভৃতি ত্রুটির বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের সময় কল্পবাজার মহকুমার মধ্যে কোনো কলেজ ছিল না। তাই কলেজ পর্যায়ে কোনো আন্দোলন হয়নি। অগ্নিযুগের বিপ্লবী এডভোকেট সুরেশ সেন, এডভোকেট জ্যোতিশ্বর চক্রবর্তীসহ মাতৃভাষানুরাগী কয়েকজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির মিছিলে গুলি ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এ আন্দোলনে বেশ কয়েকজন ভাষাসংগ্রামীকে আটকও করা হয়।

লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

১. শহীদ সাবের: জীবন ও সাহিত্য
২. মুক্তিসংগ্রামে কল্পবাজার
৩. কল্পবাজারের রাজনীতি
৪. মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে কল্পবাজার
৫. সাহিত্য দর্পণ: কল্পবাজার
৬. কালোত্তর নজরুল ও উত্তরাধুনিক সাহিত্য
৭. দলবাজী (ছোটগল্প)
৮. অগ্নিযুগের চার বিপ্লবী

যারা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড মনজুরুল আহসান খান, প্রফেসর মোশতাক আহমদ, অধ্যাপক মুফীদুল আলম, মূল্যায়ন সম্পাদক কবি অমিত চৌধুরী, কব্জবাজার সাহিত্য একাডেমীর স্থায়ী পরিষদ চেয়ারম্যান কবি-প্রাবন্ধিক সুলতান আহমেদ, কবি-গল্পকার তৌহিদুল আলম, দৈনিক কব্জবাজারবাণীর সম্পাদক এইচএম ফরিদুল আলম শাহীন, এরা সবাই আমার উত্তমর্গ। তারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। শাহবাগ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কব্জবাজার সরকারি কলেজ বাঙলা বিভাগ সেমিনার ও কলেজ লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সৃজন ব্যক্তিগত পাঠাগার, কমরেড মনজুরুল আহসান খানের ব্যক্তিগত পাঠাগার, বাবুল সহোদর পাঠাগার ব্যবহার করতে দেয়ায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

জেলা খেলাঘরের সভাপতি ও বিটিভির কব্জবাজার সংবাদ প্রতিনিধি জাহেদ সরওয়ার সোহেল, গরাণ সম্পাদক কবি মানিক বৈরাগী, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি কব্জবাজারের সদস্য সচিব করিম উল্লাহ কলিম, কব্জবাজার জেলা যুব ইউনিয়নের আহ্বায়ক শংকর বড়ুয়া রুমি, কবি-সাংবাদিক নুপা আলম, সংস্কৃতিকর্মী রিদুয়ান আলী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শহীদুল্লাহ শহীদ, সিএন্ডএফ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সেলিম-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা থাকলো।

তাছাড়া যাদের সাক্ষাৎ গ্রহণ করা না হলে বইটি পরিপূর্ণতা লাভ করতো না—তারা হলেন ভাষাসংগ্রামী বাদশা মিয়া চৌধুরী, এডভোকেট শাহনওয়াজ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ডা. জামাল উদ্দিন আহমদ, প্রফেসর মোশতাক আহমদ, এডভোকেট নুর আহমদ, বদিউল আলম, এম. এ. শুকুর প্রমুখ। সাক্ষাৎকারে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি তুলে ধরায় তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

কব্জবাজার জেলা পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় বইটি আলোর মুখ দেখছে। এ জন্য কব্জবাজার জেলা পরিষদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। আন্তরিকতার সাথে প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ায় ‘তৃতীয় চোখ’ এর প্রকাশক কবি আলী প্রয়াস এর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার ‘ভাষা আন্দোলনে কব্জবাজার’ গ্রন্থটি শতভাগ নির্ভুল- তা দাবি করছি না; ভুল হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। গ্রন্থটি কেমন হয়েছে, আরো কী কী সংযোজন-বিশোধন করা দরকার- এই বিষয়ে পাঠকের মতামত বা পরামর্শ জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

কালাম আজাদ

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সূচিপত্র

কব্জবাজারের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ৯-৫৮

ভাষাসংগ্রামীদের কথা ৫৯-৯৬

কব্জবাজারের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনকে প্রধানত দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমত ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫১ এবং দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায় বায়ালের ভাষা আন্দোলন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কব্জবাজারের অবদান সম্পর্ক তথ্য অপ্রতুল। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে যেভাবে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, কব্জবাজার তা থেকে অনেক দূরে এবং সড়ক পথের অনুন্নয়নের কারণে মহকুমা সদরের সাথে প্রত্যেক থানার দ্রুত যোগাযোগ ছিল কষ্টকর। জলপথে দুটি স্টিমার জালালাবাদ (সিনদিয়া কোং) ও ইসলামাবাদ (এ.কে.খান এন্ড কোং) সপ্তাহে দুইদিন টেকনাফ থেকে কব্জবাজার হয়ে চট্টগ্রাম যেতো। স্থলপথে ইন্দো-বার্মা বাস সিভিকিট ও সেন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কয়েকটি বাস কব্জবাজার থেকে দোহাজারী পর্যন্ত যাতায়াত করতো। দেশের খবরাখবর জানার জন্য সংবাদপত্র ওই অঞ্চলে অনিয়মিতভাবে আসতো। ২-৪ দিন পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত ‘দৈনিক আজাদ’ ও ‘সাপ্তাহিক সৈনিক’ পত্রিকা আসতো। এ সমস্ত পত্রিকার মাধ্যমে দেরিতে হলেও শিক্ষিত লোকজন দেশের খবরাখবর জানার চেষ্টা করতেন।

কব্জবাজারের সাংবাদিকতা জগতে তেমন সচেতন লোক না থাকায় এবং ওই সময়ে সেখান থেকে কোনো পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ায় কিংবা জাতীয়/আন্তর্জাতিক পত্রিকায় কাজ করা সাংবাদিক সেখানে কর্মরত না থাকায় তেমনভাবে ফলাও করে সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কিংবা সমকালীন বৈশ্বিক গণমাধ্যমেও এ সম্পর্কিত তথ্য অনুপস্থিত। তবে বিভিন্ন জনের স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কিত যথাক্রমে তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য এ রচনায় প্রধানত নেতৃস্থানীয় ভাষা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে সাক্ষাৎকার বা স্মৃতিকথার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অন্যান্য উপাদানের অভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ভাষা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিকথা বা সাক্ষাৎকারগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা যেমন তথ্য বিকৃতি, আবেগদৃষ্ট উপস্থাপনা, কথনের অতিরঞ্জন উপস্থাপনা প্রভৃতি ত্রুটির বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মাতৃভাষার সাথে একটি জাতির জাতিসত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতির কাছে মাতৃভাষা এক মূল্যবান সম্পদ তা আমাদের সকলেরই জানা। ওই অমোঘ সত্য উপলব্ধি করে ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান (জন্ম চক্রশালা-পটিয়া) তাঁর ‘ওফাতে রসুল’ গ্রন্থে লিখেন—

‘বঙ্গদেশী সকলের কিরূপে বুঝাইবে
বাখানি আরব ভাষা এ বুঝাইতে নারিব।

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষে হয় তার অমূল্য ধন।”

সন্দীপ নিবাসী কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) ‘নুরনামা’ গ্রন্থে ‘বঙ্গবাণী’ কবিতায় লিখেন—

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ।।
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন।।
আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ।।
আরবি ফারসি হিন্দে নাই দুই মত।
যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত।।
যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।।
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী।।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবার গণ।
যে সবে বঙ্গত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্যয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুরায়
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়।।
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

রামু নিবাসী মধ্যযুগের কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার তাঁর ‘মুসার সওয়াল’ গ্রন্থে লিখেন—

বুঝিবারে বাঙ্গালা সে কি ভাবের বাণী
আপনে বুঝন্ত যদি বাঙ্গালের গণ।
ইচ্ছা সুখে কেহ পাপে না দেয়ন্ত মন

অর্থাৎ ধর্ম কথা বাঙ্গালায় বুঝিলে কেহ স্বেচ্ছায় পাপে মন দিবে না।

যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এর সময়কালে ইংরেজি শিক্ষার অভিঘাত দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়, বাঙালির কাছে তখন বাংলা ভাষা ছিলো

তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গের বিষয়। গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ ও পাশ্চাত্য অনুসারী ইয়ং বেঙ্গল—উভয়ই বাংলা ভাষার অমর্যাদা প্রদর্শন করে। মাতৃভাষার এ অনাদর গুপ্ত কবি সহ্য করতে না পেরে বলে উঠেছেন—

হায় হায় পরিতাপে পূর্ণ দেশ
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।

...
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তার আশা
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ (স্বদেশ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় লিখেন—

হে বঙ্গ, ভাভারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি:-
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল কানন!
স্বপনে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে!”
পালিলাম আত্মা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও ভাষা সংস্কৃতিতে আক্রমণকারী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের মূল আঘাতটি ১৯৫২ সালে হলেও এ আন্দোলন এক দিনে হয়ে উঠেনি। বাঙালির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল এ আন্দোলন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৭৭৮ সালে ব্রিটিশ লেখক ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ব্রিটিশ কোম্পানী সরকারের পক্ষে বাঙালিদের ইংরেজি শেখার জন্য ‘A Grammar of the Bengal language’ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখন ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সি। হ্যালহেড তার ব্যাকরণের ভূমিকায় ফার্সির পরিবর্তে বাংলাকে সরকারি কাজ-কর্মে ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে, কোম্পানী সরকারের সুবিধা

হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে ফার্সির পরিবর্তে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। এ যাবৎ পাওয়া ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব এটাই। তাও একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা-লেখকের জবানিতে।

প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথম উচ্চারণ হয় রাজশাহী থেকে। ‘নুর-আল-ইমান’ পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় ওই পত্রিকার সম্পাদক মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ‘বঙ্গীয় মোসলমান ভাই বহিনের খেদমতে নুর-আল-ইমানের আপীল’ নামক সম্পাদকীয়তে উর্দু বাঙালি অনুগতদের ‘খেদমৎগার’ হিসেবে উল্লেখ করে লিখেন—

‘...শরীফ সন্তানেরা এবং তাহাদের খিদমাৎগারগণ উর্দু বলেন, বাঙ্গলা ভাষা ঘৃণা করেন, কিন্তু সেই উর্দু জবানে মনের ভাব প্রকাশ করা তো দূরে থাকুক, পশ্চিমা লোকের গিলিত চর্চিত লিখিত শব্দগুলিও অনেকে যথাস্থানে শুদ্ধ আকারে যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করিতেও অপারগ। অথচ বাঙ্গলায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুবিধা হইলেও ঘৃণা করিয়া তাহা হইতে বিরত হন।... সতেজ স্বাভাবিক বাঙ্গলা ভাষা স্বাধীনতা পাইলে তৎসঙ্গে পল্লীবাসি মোসলমান সমাজের উন্নতির যুগান্তর উপস্থিত হইবে। ...বঙ্গের মোসলমান ভ্রাতাভগ্নগণ!.... বাঙ্গলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।’

১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সে অধিবেশনেও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি ওঠে। ১৯০৭ সালে বিপ্লবী আবদুর রসুল ও আবদুল হালিম গজনবীর উদ্যোগে একটি কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ‘দি মুসলমান’ পত্রিকার সম্পাদক মজিবর রহমান উর্দুভাষী বাঙালিদেরকে ঘৃণা করে ‘দি মুসলমান’ পত্রিকায় কলম ধরেছেন। এ সম্পর্কে সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) ‘ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা’ নামক গ্রন্থে লেখেন—

“শিক্ষিত মুসলমান একটি চিন্তাধারা লক্ষ করা যেত তাদের মধ্যে অনেকেই উৎপত্তি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নিজেদের বাঙালি পরিচয় বলে স্বীকার করতে চাইতনা এবং বাংলা ভাষী হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে নিজেদের ভাষা বলে দাবি করতেন। ‘দি মুসলমান’ পত্রিকা সব সময় এই লজ্জাকর মনোবৃত্তির উপর তীব্র কষাঘাত করে এসেছে।”

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবিটি সম্ভবত প্রথম তুলেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ১৯১৮ সালে ভাষা বিতর্ক চলাকালে ‘আল ইসলাম’ পত্রিকার আশ্বিন ১৩২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান’ নামক প্রবন্ধে লিখেন—

‘মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার স্থলে বরণ করা ব্যতিত কোনো জাতি কখনো উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে পারে না।’

এ দিকে বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকলে নতুন করে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ, রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে চিঠি লিখে জানতে চান, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তার সাধারণ ভাষা কী হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে হিন্দীর পক্ষে অভিমত দেন এভাবে—‘The only possible national language for intercourse is Hindi in India’^৩।

বাংলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের রায় ছিল উর্দুর পক্ষে। অপরদিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্য থেকে বাংলার পক্ষে আওয়াজ ওঠে। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য শান্তি নিকেতনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সারা ভারত থেকে আগত ভাষাতত্ত্ববিদদের সামনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি প্রবন্ধ পাঠ করে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষার হওয়ার যোগ্যতা রাখে বাংলা, হিন্দী ও উর্দুর কথা উল্লেখপূর্বক সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে শুধু ভারত কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই বাংলা ভাষার স্থান হবে সর্বোচ্চ এবং ভাব সম্পদ ও সাহিত্যগুণে বাংলা ভাষা এশিয়া ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলে উল্লেখ করেন। ড. শহীদুল্লাহর সূক্ষ্মদর্শী প্রস্তাবনা সত্ত্বেও অনাগত স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক প্রধানত হিন্দী ও উর্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। হিন্দুরা হিন্দীর পক্ষে, মুসলমানরা উর্দুর পক্ষে। তবে এ হিন্দী ও উর্দু বিতর্কের ডামাডোলের মধ্যে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তাধারা বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সবসময় এক বিশেষ স্থান লাভ করে।

অবশ্য পূর্ব থেকে শুরু হয় মুসলমান ও হিন্দু বিতর্ক। এ বিতর্কের ডামাডোলে শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক নতুন বিতর্ক। এ সময় বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার প্রয়োজনে মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব এবং সে ক্ষেত্রে বাংলার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সাতাশি বছর আগে স্পষ্ট ভাষায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন—

‘বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়েরও অধিকসংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয় তাহা হইলে তাহাদের আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মতো হইবে না কী? চীন দেশের মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে কেহ বলে না যে চীনা ভাষা ত্যাগ করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে।’

বাংলা-উর্দু ঘিরে বাঙালি মুসলমানের ভাষা সমস্যার বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে হলেও দীর্ঘদিন ধরে উপস্থিত এবং রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণেই এ সম্পর্কে তার সুচিন্তিত মতামত দেন।

১৯২১ সালের খেলাফত আন্দোলনের সময় সারা ভারতের নেতৃস্থানীয় চার ভাগের তিন ভাগ মুসলমানগণ ভারতের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার জন্য যখন বৃটিশ সরকারকে চাপ দিচ্ছিল, তখন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী লিখিতভাবে বৃটিশ সরকারকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে বলেন—‘ভারতের রাষ্ট্রভাষা যা-ই হোক না কেন বাংলার রাষ্ট্রভাষা করতে হবে বাংলাকে।’^৪ বাংলা ভাষী শিক্ষার্থীদেরকে উর্দুর মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাদানের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ‘সওগাত’ প্রতিবাদ জানায় ১৯২৬ সালে।

বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সাধনার পথে বিরাজমান প্রথম বাধা সম্পর্কে বাংলার বিবেক আবুল ফজল চিহ্নিত করেছিলেন বাংলা ভাষার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞামূলক মনোভাব। বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে উর্দু ভাষাকে নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার যে উৎকট মানসিকতা তিনি এক শ্রেণির বাঙালি মুসলমানের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হন সেই ১৯২৬ সালে, ‘মাতৃভাষা ও বাঙালি মুসলমান’ শীর্ষক প্রবন্ধে। তাঁর শ্লেষাত্মক ভাষায় সাহসী উচ্চারণ করতে দেখা যায় এই প্রবন্ধে—

বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী? উর্দু না বাংলা? আমার মতে ইহাই সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কথা। আমগাছে আম ফলিবে না কাঁঠাল-এমন অদ্ভুত প্রশ্ন অন্য কোনো দেশে কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। (তরুণপত্র, শ্রাবণ ১৩৩২)

১৩২৬ বঙ্গাব্দের শুরুতে চট্টগ্রামে মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জাতীয়তা প্রসঙ্গে বলেন—

‘তোমরা কেবল ছাত্র নও, তোমরা বাঙালি। তোমরা বাঙালি মুসলমান। এ ক্ষেত্রে ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েই বাঙালি জাতীয়তা স্বীকৃতি পায়।’

এ প্রসঙ্গে নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী বলেন—

পুরুষানুক্রমে বাঙলাদেশের গঞ্জির মধ্যে বাস করে আর বাঙ্গালা ভাষাতে সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙালি না হয়ে আমরা অপর কোনো একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদেরত আর কোনো উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চিরতমস্যাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে পতন অবশ্যম্ভাবী। (‘সওগাত’ ৭ম, ১ম সংখ্যা (১৩৩৬)।

সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে উর্দু-বাংলা বিতর্কের সময় একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলার পক্ষে কলম ধরেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মোজাফ্ফর আহমদও এতে অংশ নিয়েছেন। আল-এসলাম, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান’ প্রবন্ধে তিনি উর্দুভাষীর দালালদের তিরস্কার করে বলেন—

যাহারা প্রকৃতই উর্দুভাষী তাহারা বাংলা দেশে উর্দু চালাইতে চান কোন্ সাহসে? কলিকাতার খিছুড়ি মোসলমানগুলিকে দেখিয়াই তাহারা মনে করেন যে, বাংলা দেশের মোসলেমগণের মাতৃভাষার কোনো ঠিকানা নাই? এটাই তাঁহাদের বিষম ভুল। কলিকাতা বাংলাদেশ বটে, কিন্তু বাংলা দেশটা কলিকাতা নহে। ..যখন উর্দু ভাষা জন্ম গ্রহণ পর্যন্ত করে নাই তখনো বাঙ্গালী মোসলমানগণের মাতৃভাষা বাংলা ছিল। বাঙ্গালী মোসলমান কবি যখন ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন উর্দুভাষা যে ভারতের কোনো দেশের বাজারে আবদ্ধ ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।... কোনো গুণে উর্দু আমাদের বরণ্য? ভারতের অর্ধেকের বেশি মোসলমান কথা বলেন বাংলায়, আর অবশিষ্ট বলেন বিভিন্ন ভাষায়। তথাপি বাঙ্গালী মোসলমানকে উর্দু ধরিতে হইবে, আচ্ছা জবরদস্তি বটে। বাজারে-শিবিরের ভাষা উর্দু, বাজারে-শিবিরে চলুক। একটা জাতিকে জোর করিয়া উর্দু শিখাইবার কী প্রয়োজন? আর উর্দুর দেশের কোনো জায়গায় এত এসলামী ভাবের দান ডাকিয়াছে যে বাঙ্গালী মোসলমানদিগকেও উর্দু গ্রহণ করিতে হইবে?...ফল কথা, বাংলাদেশে আমরা উর্দুকে কখনো প্রশ্রয় দিতে পারি না। সখ করিয়া যিনি শিখতে চান শিখুন, কিন্তু উর্দু এদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা নহে। (মোজাফ্ফর আহমদ, আল-এসলাম, ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৪ সংখ্যা)

অবিভক্ত বাংলার অবিসংবাদিত সাংবাদিক সাহিত্যিক মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (১৮৯৪-১৯৫১) তার ‘চট্টগ্রামী-ভাষাতত্ত্ব’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন—

‘পৃথিবীর কোনও ভাষাকে ভাষার পর্য্যায় হইতে বাদ দিবার অধিকার কাহারো নাই। যেই বুলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছি, সেই ভাষার হাসি কান্নার ভিতর দিয়া নিজেদের উৎকর্ষ গঠন করিয়া থাকি এবং যেই বুলির মধ্যদিয়া হা হতাশময় কাতরোক্তি করিতে করিতে চির বিদায়ের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকি, সেই মাতৃবুলির এটতা অবজ্ঞা এবং এক প্রকার গ্লানী আমরা কোন্ ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নীরবে জীর্ণ করিয়া যাই?

‘ইসলাম প্রচারক’ এর ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় ‘মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতন’ প্রবন্ধে আবদুল হক চৌধুরী বলেন—

‘আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলিয়াই সকলে স্বীকার করে যদিও নগরবাসী মুষ্টিমেয় মোসলমান উর্দু ভাষা বলিয়া থাকেন।...আমরা এখন এই দেশের

লোক বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। ...সুতরাং বঙ্গভূমিতে বাস করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত দরকার। দুঃখের বিষয়, ৫০০ বৎসর যাবৎ আমরা এই দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু এ যাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান সুলেখকের আবির্ভাব হয় নাই। ...বাঙ্গালা আদালতের ভাষা, অর্থকরী ভাষা, কার্যকরী ভাষা, দেশের ভাষা। আমি বলি, বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিলে দোষ কী?

‘বঙ্গীয় মোসলমান ও উর্দু সমস্যা’ প্রবন্ধে মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী বলেন—

‘বাঙ্গালাকে ছাড়িয়া বা বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দু শিক্ষা করা হউক ইহার আমরা আদৌ সমর্থক নহি, এবং তাহা সম্ভবপর বলিয়াও স্বীকার করি না। বাঙ্গালা বঙ্গদেশের মাতৃভাষা, এই ভাষা ত্যাগ করিবার কোনো উপায় নাই।’

মোয়াজ্জিন, ২য় বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা; আষাঢ় ১৩৩৭ সংখ্যায় ‘বাংলা ভাষা ও মুসলমান’ প্রবন্ধে আবদুল মজিদ বিএ লিখেন—

‘বহু শতাব্দী যাবৎ বাংলার ঘ্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এবং যুগ-যুগান্তর যাবৎ মাতার মুখে বাংলা শুনিয়াও বঙ্গীয় মুসলমান বাংলা ভাষাকে আদর করিতে শিখে নাই। দেশটির ন্যায় ভাষাটার প্রতিও তাহাদের যেন পরদেশী ভাব। এই বিংশ শতাব্দীতে এমন অনেক অভিজাত্যভিমাত্রী মহাত্মা আছেন যাহাদের মতে বাংলাকে মাতৃভাষা বলিলে শরাফতের হানি হয়। আমাদের ভাবের আদান প্রদান ও চিন্তাশক্তি আরবী, পারসি ও উর্দুতে প্রকাশ করিবার বৃথা চেষ্টাই মাতৃভাষা ও সাহিত্যে আমাদের দাবি ও মর্যাদা রক্ষার সুযোগকে প্রথম হইতেই আমরা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি।’

বাংলার মুসলমানগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন না কেন বাঙালি হিসেবে আমাদের ভাষা বাংলা’ উল্লেখ করে বাসনা, ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ ১৩১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য’ প্রবন্ধে হামেদ আলী বলেন—

‘আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্তান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন, আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী; আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। বাস্তবিক পক্ষে যাহারা ঐ সকল দেশ হইতে এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাহারাও এক্ষণে আরব, পারসি অথবা আফগান জাতি বলিয়া আত্মপ্রচয় দিতে পারেন না, ...মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া প্রথম যে ভাষা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে ভাষা আমরা আজীবন ব্যবহার করি, যে ভাষায় আমরা সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ প্রকাশ করি, যে ভাষায় হাটে বাজারে, ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং বৈষয়িক কার্যে কথোপকথন করি; যে ভাষায় নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখি; সেই ভাষা বাঙ্গালা। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা;আমাদের অনেকেই মোহ ছুটে নাই। তাহারা

বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্র কাননের মধ্যস্থিত পর্ণ কুটিরে নিদ্রা যাইয়া এখনো বোগদাদ, বোখরা, কাবুল, কান্দাহারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর। দুর্বল ব্যক্তির যেমন অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করে, অধঃপতিত জাতিও তেমনি অস্বাভাবিক খেয়াল আঁটিয়া থাকে।

ভাষাকে মুসলমানী করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে ‘কোহিনুর’ এর মাঘ ১৩২২ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী বলেন—

‘বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মতো সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয় সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল। বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানহীন মৌলভী সাহেবগণের বিদ্যা ও বঙ্গদেশে উর্দু শিক্ষার বিফলতা তাহার জলন্ত প্রমাণ। সুতরাং জনসমাজে উর্দু শিক্ষা হইতে নিষ্কৃতি দিলে নিশ্চয়ই জাতীয়তা বৃদ্ধির অনিষ্ট হইবে না। ...ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য গুণে প্রয়োজন।’

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন—

‘কেহ উর্দুর স্বপ্নে বিভোর হইলেও বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাঙালা এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈত থাকা উচিত নয়।’ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা. ১৩২৫)।’

সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারলেও ভাষা ত্যাগ করতে পারবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়ে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ‘বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা’ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘উর্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য’ প্রবন্ধে লিখেন—

‘আমি ভিখারী হইতে পারি, দুঃখ অশ্রুর কঠিনভারে চূর্ণ হইতে আপত্তি নাই। আমি মাতৃহারী অনাথ বালক হইতে পারি—কিন্তু আমার শেষ সম্বল-ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমার ভাষা চুরি করিয়া আমার সর্বস্ব হরণ করিও না। মাতৃভাষাকে কেমন করিয়া ভুলিব? এমন অসম্ভব প্রস্তাব করিয়া আমার জীবনকে অসাড় ও শক্তিহীন করিয়া দিতে চায়- কে? বিদেশী ভাষায় কাঁদিবার জন্য—কে আমাকে উপদেশ দেয়?.. গৃহের পার্শ্বে উর্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালী মুসলমানের হৃদতন্ত্রীতে জাগে না। সে তাহাতে যথার্থ আনন্দ ও শান্তি লাভ করে না।’

মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা করাকে লজ্জাজনক উল্লেখ করে খাদেমাল এসলাম বঙ্গবাসী ‘বাঙালির মাতৃভাষা’ প্রবন্ধে বলেন—

‘মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া কিংবা বাঙ্গলা জানি না ভুলিয়া গিয়াছি, এরূপ বলা—এই মারাত্মক রোগ কেবল এক শ্রেণির মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়। তাহাদের এরূপ নীতি অবলম্বন করা কি বাস্তবিক পক্ষে নিতান্ত লজ্জাজনক নহে? যাহারা এরূপ আচরণ করে তাহারা যে আপন মাতা ও মাতৃভূমির প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এবং নিজস্ব মুখে নিজের মায়ের এবং দেশের দীনতা জ্ঞাপন করে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।’

ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজের মাতৃভাষাকে অস্বীকার করাকে নিজের মা-কে অস্বীকার করার নামান্তর উল্লেখ করে ‘সাহিত্যিক, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা; আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাঙ্গলা সাহিত্য ও মুসলমান’ প্রবন্ধে মোহাম্মদ গোলাম মাওলা বলেন—

বাঙ্গলার পরিবর্তে আরবী ও উর্দু শব্দ ব্যবহার করার সঙ্গে যেন জাতীয়তা বা ধার্মিকতার একটা অন্ধ মনোভাব সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ...বাঙ্গলা ভাষার প্রতি একটা হৃদয় নিহিত স্বাভাবিক মমতা যেন আমাদের নেই, আরবী, ফার্সি বা উর্দুই যেন তদপেক্ষা আমাদের চেয়ে বেশি আপন। নিজের মাতৃভাষার প্রতি এই যে একটা অজ্ঞাত অশ্রদ্ধা ও তচ্ছিন্নতার ভাব এবং অন্যভাষার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন দরদ ইহাকে আমি বড় অশ্রদ্ধা করি। ...আরবী আমাদের ধর্মভাষা, আল্লাহর বাণী উহাতে নাজিল হইয়াছে, রসুলের সুনত ও হাদিস উহাতে, তাই উহা আমাদের প্রিয়, ফার্সি ও উর্দুতে ইসলামের আলেমগণ অসাধ্য সাধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাই উহাদিগকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু উহাদিগকে ভালবাসিব বলিয়া নিজের মাতৃভাষাকে অপমান করিব...ইহা কোন ন্যায়ের অন্তর্গত! ...ধর্মের গোঁড়ামি একবার আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্ধ শতাব্দী পিছাইয়া ফেলিয়া দিয়াছে, আবার যেন মুসলমানী বাঙ্গলার মোহ আমাদের পথ না ভুলায়।’

১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙালি প্রতিনিধিদের বিরোধিতায় সে উদ্যোগ সফল হয়নি। মাতৃভাষাকে সকল পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্য শিখা গোষ্ঠীও সংগঠিত আন্দোলন চালায় এ সময় থেকেই। এক রাষ্ট্রভাষার নির্বাচন নিয়ে হিন্দু উর্দুর সমর্থকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ। এ দুটি দিক বিবেচনা করে ১৯৩৭ সালের ২৩ এপ্রিল আজাদ একটি দারুণ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। পত্রিকার ভাষায়—

সাহিত্যের দিক দিয়ে বাংলা ভাষা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের সংখ্যাও বেশি। অতএব, বাংলা সবদিক দিয়েই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার দাবি করতে পারে।...রাষ্ট্রভাষার নির্বাচন লয়ে হিন্দী-উর্দুর সমর্থকদের মধ্যে আজ যে তুমুল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে, তার ফলে হয়তো উর্দু ও হিন্দীর মধ্যে কোনোটারই রাষ্ট্রভাষার আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হলে এ সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষের আশঙ্কা বহু পরিমাণ কমে যেতে পারে।

১৩৪৫ বাংলা সনে ভারতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এ সম্পর্কে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে ‘বিদ্বজ্জনের আলোচনা’ শিরোনামে এক সংবাদ ও আলোচনায় বলা হয়—

‘সম্প্রতি রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করার নিমিত্তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে একটি সভার অধিবেশন হয়। সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং অতুল চন্দ্রগুপ্ত, অর্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রফুল্ল কুমার সরকার, সুন্দরী মোহন দাস ও দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ‘বাংলার বহুলতার জন্য লিখিত ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা উচিত: বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাঙালি মাত্রেরই দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহারে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা কর্তব্য, বাংলাদেশ প্রবাসী অন্য ভাষাভাষী ব্যক্তিদের সহিত যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষায় কথোপকথন ও চিন্তার বিনিময় কর্তব্য, এই সভার মতে ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্ধারণের চেষ্টা কালোচিত নহে ও অসমীচীন। ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত মর্মে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়। ওই সভায় ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ‘সাহিত্যের গৌরব থাকিলেই ভাষার প্রসার হয় না।’ ব্যস, এখানেই সমাপ্তি ঘটে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের আলোচনা’

ইতোমধ্যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শুরু হয় পাকিস্তান আন্দোলন। এ আন্দোলনের সময় আবার উঠে আসে রাষ্ট্রভাষা বাঙলার প্রশ্নটি। ইতোমধ্যে অনেক লেখকরা লিখেন পাকিস্তান নিয়ে বিভিন্ন রকমের বই। ওই সব লেখকদের মধ্যে কতিপয় লেখক উর্দু ভাষার পক্ষে লিখলেও কয়েকজন লেখক বাংলা ভাষার পক্ষেই লেখেন। তার মধ্যে অন্যতম মুজীবর রহমান খাঁ। মুজীবর রহমান খাঁ তার রচিত ‘পাকিস্তান’ গ্রন্থে ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, ‘মুসলিম লীগ এতদিন উর্দুকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া প্রচার করিয়াছে সত্য। কিন্তু যতদিন লীগ অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিল, ততদিন তার এ দাবির জোর ছিল। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা ভিন্ন আর কিছুই হতে পারেনা। (পাকিস্তান, মুজীবর রহমান খাঁ, পৃ: ১৭২)। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ‘ভারতে উর্দুর সাথে একমাত্র বাংলা সমমর্যাদা দাবি

করিতে পারে। এই উভয় ভাষা যেমন শব্দ সম্পদে উন্নত, তেমনই উভয় সাহিত্যও বিশ্বের বড় বড় সাহিত্যের পার্শ্বে স্থান লাভের যোগ্য। সুতরাং নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানে যেমন বাংলা, হিন্দুস্থানে যেমন হিন্দী তেমনই পশ্চিমা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে উর্দু।’ মুজীবর রহমান খাঁর মতো একই ধরনের মতামত প্রকাশ করেন হাবিবুল্লাহ বাহার তাঁর ‘পাকিস্তান’, তালেবুর রহমানের ‘পাকিস্তানবাদের ক্রমবিকাশ’ ও ‘সর্বহারাদের পাকিস্তান’ গ্রন্থে এবং অধ্যাপক আবুল মনসুর আহমদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি ফররুখ আহমদ, ড. ফেরদৌস খান প্রমুখ তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম কর্তৃক প্রাদেশিক কাউন্সিলের নিকট পেশকৃত খসড়া ম্যানিফেস্টোতে বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এর নেতৃত্বে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই আবুল মনসুর আহমদ দৈনিক মিল্লাত এর সম্পাদকীয় কলামে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা ভাষাই হবে, বলাইবাছল্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। একই মাসের ৩০ জুন দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এর কয়েকদিন পরই যখন রাষ্ট্রভাষা নিয়ে দিন দিন জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক তখনি মো. তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ, ও কামরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় গণ আজাদী লীগ। এই দলের ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়—‘বাংলা হইবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’।

মাসিক মোহাম্মদীতে ১৩৫০, কার্তিক সংখ্যায় আবুল মনসুর আহমদ ‘পূর্ব পাকিস্তানের জবান’ শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করে বলেন—

‘উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাংলাকে যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো।’

কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও ভিন্ন মতাবলম্বীদের অভাব ছিলো না এ পূর্ব বাংলায়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে বর্তমান ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এক উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৬০) ঘোষণা করেন যে, ‘উর্দু হবে পাকিস্তানের জাতীয়

ভাষা।’ বিভাগ পূর্বকালে ১৯৪৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন এক শ্রেণির শিক্ষিত ব্যক্তির রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিপক্ষে বক্তব্য রাখার কঠোর সমালোচনা করে ‘পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ফররুখ আহমদ বলেন—

পাকিস্তানের অন্তত: রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা সর্ববাদীসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন, যা নিতান্ত লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাদের অভিমত। কী কুখ্যাত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পেছনে কাজ করছে—এ কথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় ২০০ বছর বাঙলা ভাষায় ইসলামের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলাটিপে মারার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছি। (মাসিক সওগাত, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৪)।

চৌধুরী খালিকুজ্জামানের উর্দুর পক্ষে দালালির এক মাস ছয় দিন পর অর্থাৎ ২২ জুন কলকাতার ইত্তেহাদ পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে ‘বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব’ শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বামপন্থী লেখক-সাংবাদিক আবদুল হক বাংলার ভাষাগত স্বাভাব্য এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন। ৩০ জুন দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ প্রবন্ধে বাঙলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

যে স্বাধীনতা আসছে, ভাষাগত স্বাধীনতা না পেলে তা হবে আংশিক এবং বদ্ধমুখ স্বাধীনতা। অতএব, পাকিস্তানের—কেবল পূর্ব পাকিস্তানের নয়, পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় পাকিস্তানকে নিয়ে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবার যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী বাংলা ভাষার।’

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক মাসে আগে (জুলাই মাসে) আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ অভিমত ব্যক্ত করেন, হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর যুগ্মসংগত কারণে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদের বক্তব্য খণ্ডন করে ২৯ জুলাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা’ নামক প্রবন্ধ লিখে জোরালো প্রতিবাদ করে রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

‘কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ...যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নাই। ...পূর্ব পাকিস্তানের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দীকে গ্রহণ করা হইলে

ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতার নামান্তর হইবে। ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এটা বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতির বিরোধীই নয়, বরং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিহর্গিতও বটে। (সূত্র: দৈনিক আজাদ, ২৯ জুলাই ১৯৪৭)

৩০ জুলাই ১৯৪৭ দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ‘রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব’ নামক প্রবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন মাহবুব জামাল জাহেদী।^১ উর্দুকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা করার উদ্ভট স্বপ্নকে আলাদিনের বিচিত্র প্রদীপ অপেক্ষা বিস্ময়াবহ বলে উল্লেখ করে শেখ আবদুল গফুর জালালী ‘আল ইসলাম’ ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় ‘শিক্ষা বিস্তারের উপায়’ প্রবন্ধে বলেন—

‘বাঙ্গালা দেশে জনগ্রহণ করিয়া, বাঙ্গলার জলবায়ুতে দেহপুষ্ট করিয়া যাহারা মাতৃভাষা হইতে বাঙ্গালা কথা শুনিয়া আসিয়াছেন এবং মাতৃস্তন পানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা কথা শিক্ষা করিয়াছেন তাহারাই আবার বাঙ্গালাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নাসিক্য কুঞ্জন করিয়া থাকেন। যাহারা উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার কল্পনা জল্পনা আঁটিতেছেন, তাহাদের এই উদ্ভট কল্পনা আলাদিনের বিচিত্র প্রদীপ অপেক্ষাও বিস্ময়াবহ বটে।’

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ‘কৃষ্টি’ নামক এক পত্রিকার ১৩৫৪ এর কার্তিক সংখ্যায় ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ এনামুল হক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার উপযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন,

‘ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ হইবে। উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, ...রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় ও পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দু ওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষার সূত্রে শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র’^২

১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বেচারাম দেউরির বাসভবনে গুরু হওয়া সম্মেলনে ৭ সেপ্টেম্বর সাবজেক্ট কমিটির গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—

‘বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হোক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হইবে তৎসম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।’

বাংলা, পাকিস্তান ও ভারত সৃষ্টির আগে তথা ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র ফেডারেশন কর্মী শহীদ সাবের ও সাইমুম শমসের কব্জবাজার থেকে জাগরণ নামে একটি সাহিত্য প্রকাশ করেন। ‘জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত’ স্লোগানে প্রকাশিত ‘জাগরণ’-এ বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দানের বিষয়টি তুলে ধরে সম্পাদকীয় লেখেন শহীদ সাবের।

এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) উত্থাপিত ও চৌধুরী খালেকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৬০) সমর্থিত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগুরু মুসলিম অঞ্চলগুলি নিয়ে ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ (Independant States) গঠনের কথা উল্লেখ থাকলেও ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে মুসলিম আইন পরিষদ সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধিদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ (Independant States) থেকে ‘এস’ কে অসাবধানতাপ্রসূত ও ছাপাখানার ভুল বলে উল্লেখপূর্বক ‘পাকিস্তান’ এর পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফলে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের মিথ্যা প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে এ সময় সারা প্রদেশের ন্যায় চট্টগ্রামের অধিকাংশ নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ওই ইস্যুকে ঘিরে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ওই নির্বাচন হয়েছিল প্রদেশগুলোতে সরকার গঠনের জন্যে। কোনো প্রদেশ বিভক্ত করার কথা ছিলো না। কিন্তু মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও কটকৌশলের কাছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বকারী প্রধান দল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮), পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪), সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০) প্রমুখ কংগ্রেস নেতা হার মানে। ব্রিটিশ শাসকদের সর্বশেষ প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ও তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের-রাজস্থানের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত সিন্ধু, পাঞ্জাবের পশ্চিম অংশ নিয়ে গঠিত পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (যা আফগানিস্তানের পাখতুন অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল) এবং পূর্বাঞ্চলে তৎকালে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলা নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় একটি নতুন রাষ্ট্র, যার নাম পাকিস্তান। এই পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে প্রায় ১২০০ মাইল ব্যবধান; মধ্যবর্তী ভূভাগের পুরোটাই ভারতের। পরবর্তীতে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্বাংশের নাম দেওয়া হয় পূর্ব বাঙলা (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশ) আর পশ্চিমাংশের চার প্রদেশকে (পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান) একত্রে নাম দেওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান। যে নির্বাচনের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয় সে নির্বাচনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের দাবিদার নিখিল ভারত

মুসলিম লীগ কেবল পূর্বে বাংলাদেশ ও সিন্ধুতে সরকার গঠন করতে পারে। পাঞ্জাবে সরকার গঠন করে ইউনিয়নিস্ট পার্টি, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে কংগ্রেস। অর্থাৎ এই প্রদেশসমূহে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। সেই মতে, কেবল পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্বে বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তান হওয়া উচিত ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শেষ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৯৪), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)’র বড় ভাই কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০) এবং কংগ্রেস নেতা কিরণ শঙ্কর রায় (১৮৯১-১৯৫১), প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখের দাবি মোতাবেক বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশকে (আজকের পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরা-আসাম ও বাংলাদেশ) একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নেয়া যেতো। যদি সেটাই হতো তাহলে ১৯৪০ সালে বাংলার বাঘ এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত ও চৌধুরী খালেকুজ্জামান সমর্থিত লাহোর প্রস্তাবের ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ (Independant States) এর সাথে সংগতিপূর্ণ। তাহলে বাংলা হতো নিখিল বঙ্গভূমির বিরাট এক জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু বাস্তবে তা না করে, জনগণের কোনো ম্যাগেট না নিয়েই পশ্চিম পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেয়। আর পূর্ব পাঞ্জাব এবং বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশ ও উত্তরাঞ্চলের অনেকটা তুলে দেয়া হয় ভারতের হাতে। মোটকথা ভারত বিভাগ ছিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অদূরদর্শী ও স্বার্থপর কিছু নেতার দ্বারা বানরের পিঠা ভাগের মতো।

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত নামক পৃথক দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হন। ভারত বিভক্তির সাথে সাথে পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ বিভবান শিক্ষিত হিন্দুরা চলে গেলো পশ্চিমবঙ্গে আর অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান যারা শিক্ষিত ও নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠলো, তারা যেন রাতারাতি আরব সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মের আবেগে পাকিস্তানি ভাবধারায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। ফলে সংস্কৃতির অঙ্গনে দেখা দিল শূন্যতা। তবে বাঙালি মুসলমানদের পাকিস্তান প্রেমের আচ্ছন্নতা কেটে যেতে বেশি সময় লাগেনি। পাকিস্তান কায়মের এক বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি নিষ্পত্তি না করেই এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, ডাকটিকেট, মানি অর্ডার, ট্রেন টিকেট ও টাকার উপর উর্দু এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতিতে আঘাত শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে পটিয়ার কৃতিসন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১) পাকিস্তান সৃষ্টির ১৭ দিনের মাথায় ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় গঠন করেন ‘তমদুন মজলিস’। অনেকটা ইসলামী তমদুনকে সমন্বিত করার

প্রত্যয়ে এ সংগঠন গঠিত হলেও এ সংগঠনই প্রথম বাংলা ভাষার দাবিতে প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। এর ধারাবাহিকতায় ওই সনের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদুন মজলিস থেকে প্রকাশিত হয় ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ শিরোনামে পুস্তিকা। এই পুস্তিকায় অধ্যাপক আবুল কাসেম ‘আমাদের প্রস্তাব’, ড. কাজী মোতাহের হোসেন ‘রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা’ এবং আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯) ‘বাংলাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে’ নামক তিনটি প্রবন্ধ লিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পাকিস্তান আমলে প্রথম আন্দোলন সংগঠিত করেন। এ পুস্তিকায় ‘আমাদের প্রস্তাব’ প্রবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পাশাপাশি তমদুন মজলিস কর্তৃক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন অন্যথায় স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর বিকালে তমদুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (ঢাকা কলেজ) ছাত্রাবাস নূপুর ভিলায় ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু করা হোক’ শীর্ষক এক ঘরোয়া সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ শিরোনামের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘোষণাপত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং ঘোষণাপত্র মতে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঐক্যমত হয়। এ সেমিনারে অংশ নেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহের হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), কবি জসীম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬), অধ্যাপক কাজী আকরাম হোসেন, অধ্যাপক শামসুল হক, শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০২), সানাউল্লাহ নূরী (১৯২৮-২০০১)। ভাষা আন্দোলনের প্রথম ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গণ্য এ পুস্তিকা জনমনে রেখাপাত করে এবং ব্যাপক জনমত তৈরি করে। এ অবস্থায় তমদুন মজলিস মাওলানা আকরাম খাঁ (১৮৭০-১৯৬৮), মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী (মেম্বার অব লেজিসলেটিভ এসেম্বলী), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩), আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৮৯৭-১৯৭৮), শামসুন নাহার মাহমুদ (১৮৮৮-১৯৬৪) সহ হাজারো মানুষের দস্তখত সংগ্রহ করে তা স্মারকলিপি আকারে ১৯৪৭ সালের ১৪ নভেম্বর পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীনকে প্রদান করে। কিন্তু এতেও শাসক দলের টনক না নড়ায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে সভা সমাবেশের আয়োজনে নামে। ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে প্রথম জনসভা হয়। তমদুন মজলিসের কর্ণধার অধ্যাপক আবুল কাসেম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের (বর্তমানে ছাত্র সংসদ) ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ আহমদ (১৯২৩-১৯৭১; পরবর্তীতে মৌলভী ফরিদ আহমদ নামে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পরিচিত এবং একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক ভূমিকার

কারণে ঘৃণিত হন ও নিহত হন), অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১; শহিদ বুদ্ধিজীবী), আবদুর রহমান চৌধুরী (১৯২৬-১৯৯৪; পরবর্তীতে বিচারপতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এ কে এম আহসান (পরে সিএসপি/সচিব), কল্যাণ দাশগুপ্ত, এস. আহমদ প্রমুখ।

ডাকসু’র সভাপতি হিসেবে ফরিদ আহমদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম করার লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন। উত্থাপিত প্রস্তাব জনার সুবিধার্থে নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(ক) বাংলাকে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার বাহন করা হোক।

(খ) রাষ্ট্রভাষা ও লিগুয়া ফ্রাংকা নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য আসল সমস্যাকে ধামাচাপা দেয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

(গ) পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬) উর্দু ভাষার দাবিকে সমর্থন করার জন্য সভা তাঁদের আচরণের নিন্দা করছে।

(ঘ) সভা মর্নিং নিউজ এর বাঙলা বিরোধী প্রচারণার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবক্ষা প্রদর্শনের জন্য পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।^৮

ফরিদ আহমদ তখন একদিকে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র, তেমনি অন্য দিকে ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজ এর ইংরেজি অধ্যাপক ছিলেন। সভাশেষে অধ্যাপক আবুল কাসেম এর নেতৃত্বে একটি বিশাল মিছিল সহকারে সেক্রেটারিয়েট অভিমুখে গমন করে মুখ্যমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন, নুরুল আমিন, সৈয়দ আফজালের বাসভবন ও সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও করা হয়।^৯ এভাবে ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলন অঙ্কুরিত হতে থাকে। এরইমধ্যে ১৯৪৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর তমদুন মজলিসের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সাব কমিটি নামে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে গঠিত প্রথম এ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন ঢাবির তরুণ অধ্যাপক ড. নুরুল হক ভূঁইয়া (১৯২৩-১৯৯৮), সদস্য- অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক আবদুল গফুর, গণতান্ত্রিক যুবলীগের কমরেড মো. তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), ডাকসু ভিপি ফরিদ আহমদ (১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেন এবং পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ এর সভাপতি) অলি আহাদ, ফজলুর রহমান ভূঁইয়া (এসএম হলের প্রচার সম্পাদক), শামসুল আলম (১৯২৬-১৯৯৪; এসএম হলের সমাজসেবা সম্পাদক), শওকত আলী (১৯২৮-১৯৭৫), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৬-১৯৭৫; এসএম হলের ভিপি ও তমদুন মজলিসের সদস্য ও পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী

রাষ্ট্রপতি), আজিজ আহমদ (১৯১৬-১৯৬৫), প্রকৌশলী আজিজুর রহমান, আখলাকুর রহমান, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, আবুল খায়ের (নোয়াখালী থেকে তৎকালীন আইন পরিষদ সদস্য), আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, প্রকৌশলী নুরুল হুদা (১৯২৪-২০০৭; ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিনিধি), মির্জা মাজহারুল ইসলাম (ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিনিধি), সিদ্দিক উল্লাহ (জিএস, এসএম হল), এ কে এম আহসান, শাহেদ আলী, সানাউল্লাহ নূরী, অধ্যাপক রেয়াত খান (একমাত্র উর্দুভাষী সদস্য), খালেদ নেওয়াজ খান (১৯২৬-১৯৭১), আবদুল মান্নান, কামরুদ্দিন আহমদ (১৯১২-১৯৮২), আবদুর রহমান চৌধুরী, আনোয়ারা খাতুন (১৯১৯-১৯৮৮), নুরুল আলম (টাঙ্গাইল), লিলি খান, নইমুদ্দিন আহমদ (১৯২৪-১৯৬৯), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪) প্রমুখ।

ইতোমধ্যে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকা হতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর প্রতিবাদ করায় এবং ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমানে ঢাকা কলেজ) লেকচারার ফরিদ আহমদকে ডেকে সতর্ক করে দিলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকা হতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারি পদত্যাগ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার ভাষায়—

‘ঢাকা, ৬ই জানুয়ারী। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকা হতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে ঢাকার সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ইংরেজির লেকচারার মি: ফরিদ আহমদ পদত্যাগ করেছেন।’ - এ, পি (সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ জানুয়ারী ১৯৪৮)

সরকারি চাকুরী থেকে ইস্তফাদানকারী ফরিদ আহমদ কক্সবাজারের সন্তান হওয়ায় চট্টগ্রাম জেলা জুড়ে এ খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থানগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের মহকুমা কক্সবাজারের রামুতেও এ খবরটি পৌঁছে। অনেক আগে থেকেই তথা খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আবদুল মজিদ সিকদার, মাওলানা মজহেরুল হক চৌধুরী, রাস মোহন বড়ুয়ার বদৌলতে রাজনৈতিক দিক থেকে রামুর পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত রামু খিজারী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কক্সবাজারে ভাষা আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ওই স্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্র মো. বদরুজ্জামান (পরবর্তীতে ডা. এম বি জামান নামে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ), নবম শ্রেণির ছাত্র ওবায়দুল হক (যিনি ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে

কক্সবাজার মহকুমা থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী কবির আহমদ চৌধুরীর একজন ক্ষুদ্রে কর্মী হিসেবে কাজ করেন এবং পরবর্তীতে ফতেখাঁরকুল ইউপি চেয়ারম্যান ছিলেন), রসিক চন্দ্র বড়ুয়া, ৮ম শ্রেণির ছাত্র নুরুল ইসলাম হেলালী (পরবর্তীতে অধ্যাপক, বর্তমানে বাংলাদেশ লেখক শিবির-চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি) প্রমুখের নেতৃত্বে তৎক্ষণাত্ ক্লাস বর্জন করে মিছিল বের হয়ে রামু চৌমুহনীতে মিলিত হন। এ দিকে বড় ভাইদের মিছিলে অংশগ্রহণ দেখে রামু সেন্ট্রাল প্রাইমারী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র আমিরুল কবির চৌধুরী, মোশতাক আহমদ (প্রফেসর), ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী (১৯৩৭-২০১০) প্রমুখ মিছিলে যোগ দেন। মিছিল পরবর্তী সময়ে চৌমুহনীতে এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তব্য রাখেন মো. বদরুজ্জামান (১৯৩০-২০০৮), ওবায়দুল হক (১৯৩২-২০১২), রসিক চন্দ্র বড়ুয়া, জাকের আহমদ, মোশতাক আহমদ, আমিরুল কবির চৌধুরী প্রমুখ। ওই সমাবেশে আমিরুল কবির চৌধুরী জীবনের প্রথম বক্তৃতা করেছেন বলে তার ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কক্সবাজার’ শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির একজন ছাত্র হয়ে কীভাবে বক্তৃতা রাখতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অনেকে। ওই সমাবেশ থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আমরণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারি মৌলভী ফরিদ আহমদ অধ্যাপক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কক্সবাজারে চলে আসেন এবং কক্সবাজারের সচেতন ব্যক্তি, ছাত্রদের মাঝে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করেন। ওই সময় কক্সবাজার সরকারি বিদ্যালয় সংলগ্ন বেণী মাধব পাল এবং বর্তমান নিরিবিলি হোটেলস্থ এডভোকেট নলিনী রঞ্জন দত্তের বাসগৃহে (বর্তমান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন) বৈঠকে রাজনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি ভাষা আন্দোলন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন বলে ভাষাসংগ্রামীদের স্মৃতিকথায় উঠে আসে।

এ ধরনের বৈঠকে এডভোকেট প্রবোধ রঞ্জিত, এ্যাডভোকেট সুরেশ সেন, এম.এ. সালাম (প্রাক্তন পৌর চেয়ারম্যান ও মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষালম্বন করে শাস্তি কমিটির দায়িত্ব নেন), মহিউদ্দিন মোক্তার (পরবর্তীতে কক্সবাজার মহকুমা আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র সাত মাসের ব্যবধানের মধ্যে পাকিস্তানের সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-গোষ্ঠীর আসল চরিত্র ফুটে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশনে মুসলিম সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিম লীগের মুসলিম জনপ্রতিনিধির কেউ এর প্রতিবাদ না করলেও পূর্ব বাংলার সদস্য কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১; মুক্তিযুদ্ধে শহীদ) গণপরিষদের সেই সিদ্ধান্তের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করে

বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১), ওই অধিবেশনের সহ-সভাপতি তমিজ উদ্দিন খান (১৮৮৯-১৯৬৩), পূর্ব বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪), পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী গজনফর আলীর তীব্র বিরোধিতার মুখে তা নাকচ হয়ে যায়। লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন, ‘মাননীয় সদস্য পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভুল ধারণা, মিস আভারস্ট্যাভিং সৃষ্টির অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। খাজা নাজিম উদ্দিন তখন সদৃষ্টে ঘোষণা করেন—‘পূর্ববাংলার অধিকাংশ অধিবাসীরই এ মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।’

মোহাজির ও পুনর্বাসন মন্ত্রী গজনফর আলি খান প্রস্তাবটির বিরোধিতা ও উর্দু ভাষার সাফাই গেয়ে বলেন, ‘পাকিস্তানের একটিমাত্র সাধারণ ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে উর্দু। আমি আশা করি, অচিরেই সমস্ত পাকিস্তানি ভালোভাবে উর্দু শিক্ষা গ্রহণ করে উর্দুতে কথাবার্তা বলাবলিতে সক্ষম হবে।’ সেই সাথে তিনি উর্দু ভাষার সঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির যোগসূত্র আবিষ্কার করে বলেন, ‘উর্দু কোনো প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা। উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।’^{১০}

পক্ষান্তরে গণপরিষদে কংগ্রেস দলের সম্পাদক রাজকুমার চক্রবর্তী সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন—

উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়। তা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরতলার কিছু মানুষের ভাষা। ... বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্য কোনো চাপ দিচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলারও স্বীকৃতি।’

কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন তার দল কংগ্রেস এর হিন্দু সদস্য শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, প্রেমহরি বর্মা, প্রভাষ লাহিড়ী ছাড়া আর কোনো পূর্ব বঙ্গীয় প্রতিনিধির সমর্থন পায়নি। ফলে সংশোধনী প্রস্তাবটি সাম্প্রদায়িকতায় গিয়ে পৌঁছায়।

গণপরিষদের অন্যতম ব্যবহারিক ভাষা বাংলা করার বিপক্ষে পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি প্রতিনিধিদের ভোট দেওয়ার খবর এসে পৌঁছলে ঢাকা ছাত্র সমাজে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে ওই সময় তমদুন মজলিস পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিতে অন্যান্য দলের লোক অন্তর্ভুক্ত করে শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিকে সম্প্রসারিত করে ২ মার্চ

১৯৪৮। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ঢাকায় এক সভায় মিলিত হয়ে ১১ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১১, ১২, ১৩ মার্চের প্রতিবাদ দিবস প্রদেশব্যাপী পালন করা হয়। এর প্রভাব কল্লবাজার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ১১ মার্চের প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের পর খাজা নাজিম উদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৮ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ভাষাচুক্তির ৮ দফা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১। ২৯ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ থেকে বাংলা ভাষা প্রশ্নে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরক অবিলম্বে মুক্তি দেয়া হবে।

২। পুলিশী নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে বিবৃতি দিবেন।

৩। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং বাংলাকে পাকিস্তান গণপরিষদে ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে স্থান দেওয়ার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

৪। ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে প্রদেশের সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

৫। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেনা।

৬। আন্দোলন সমর্থনকারী সংবাদপত্রগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৭। যেসব স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে সেখান থেকে তা প্রত্যাহার করা হবে।

(সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের দাবির মুখে খাজা নাজিমুদ্দিন নীচের দফাটি নিজ হাতে লিখে দেন)।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনায় আমি নিঃসন্দেহে হয়েছি যে, এ আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়।

যদিও জিন্নাহ তা পরে অস্বীকার করে ‘এটা জোর করে আদায় করা হয়েছে মর্মে ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করে বলেন—

The State language therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred million Muslims of this sub-continent, a language understood throughout the length and breadth of Pakistan and above all a language which, more than any other provincial language, embodies the best that is in Islamic culture and

Muslim tradition and is nearest to the language used in other Islamic countries."

পাকিস্তানের গভর্নর মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মনে করেছিলেন, কয়েক শতাব্দী আগে বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করতে এসে সংস্কৃত ভাষাভিমानी ব্রাহ্মণ শাসকেরা যেমন ‘বাংলা রৌরব নরকের ভাষা’ বলে ঘোষণা করে অত্যাচার শুরু করেছিলেন বাংলাভাষাভাষী স্থানীয় লোকদের উপর—যার পরিণামে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল ও অন্যান্য দেশে; ঠিক তেমনি বিশ শতকের মধ্যপাদেও উর্দুভাষী শাসক জিন্নাহর ঘোষণায় পাকিস্তানের নেটিভ বাঙালি প্রজারা তাই করবে।^{১১} কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। জিন্নাহ বক্তব্যের সময় আবদুল মতিন (ভাষা মতিন), পটিয়ার কৃতি সন্তান একেএম হাসান, নইমুদ্দিন, আতাউর রহমান খান ‘নো’, ‘নো’ বলে চিৎকারে তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে জিন্নাহ বলেন—*Its is my views.* পরক্ষণে তিনি কথা না বাড়িয়ে *I hope Bengal will not fail me* বলে বক্তব্য শেষ করেন। ওই দিন বিকেলে তমদ্দুন মজলিসের অধ্যাপক আবুল কাসেম, শামসুল হক, তাজউদ্দিন আহমদ, লিলি খান, আজিজ আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কমরেড মো. তোয়াহা, অলি আহাদ, নঈমুদ্দিন ও এম শামসুল আলমের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর সাথে দেখা করেন। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলা এ বৈঠকে জিন্নাহ প্রতিনিধি দলকে পাকিস্তানের সংহতির স্বার্থে এক রাষ্ট্রভাষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ নিয়ে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে জিন্নাহর তর্ক হয়। তর্কের এক পর্যায়ে মাগরিবের আজান দিলে নামাজের বিরতিতে শামসুল হক জিন্নাহকে নামায পড়ার আহ্বান জানালে পরিবেশ জটিল হয়ে পড়ে (জিন্নাহ ইসলামকে ভালবেসে পাকিস্তান আন্দোলন, পাকিস্তানের জনক; উর্দুকে ভালবাসলেও বিলেত ফেরত ব্যক্তি হিসেবে নামাজ পড়েননি তেমন, পাশাপাশি নামাজ কিভাবে পড়তে হয় তাও জানতেন না, ব্যক্তিগত স্বার্থে নেতা হওয়ার জন্য মুসলিম লীগের সাথে জড়িত হয়েছিলেন। যার কারণে প্রতিনিধিদলের নেতা শামসুল হক নামাজ পড়ার কথা বললে পরিস্থিতি জটিল হয়ে যায়)।^{১২} এতে বিতর্ক সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ভাষা প্রশ্নে শেষ না হলেও প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে জিন্নাহকে স্মারকলিপি প্রদান করে।

জিন্নাহ ঢাকা সফর শেষে চট্টগ্রাম সফরে আসেন। ১৯৪৮ সালের ২৫-২৭ মার্চ চট্টগ্রামের দামপাড়া পুলিশ লাইনে অবস্থানকালে উর্দু ভাষার পক্ষে এবং আরবী হরফে বাংলা লেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। মুসলিম লীগ নেতা এ কে খান ও আহমদ সগীর চৌধুরী এ সভায় বক্তব্য রাখলেও জিন্নাহ সভায় উর্দুর পক্ষে বলায় শ্রোতাদের মধ্যে থেকে জোরালো কোনো প্রতিবাদ হয়নি। কিন্তু এ খবরটি বাইরে

প্রচার হলে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ ক্ষোভে ফেটে উঠে। এর কয়েকদিন পর চট্টগ্রামে সাহিত্যিক মাহবুব আলম চৌধুরী (১৯২৭-২০০৭), গোপাল বিশ্বাস, ফরমান উল্লাহ খান ও শহিদ সাবের (পরবর্তীতে একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবী) প্রমুখ মিলে ‘সংস্কৃতি বৈঠক’, ‘তমদ্দুন মজলিস’, ‘ছাত্র ফেডারেশন’ প্রভৃতি সমমনা দল নিয়ে জেএমসেন হলে জিন্নাহর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এক সভার ডাক দেয়। প্রতিবাদ সভার প্রচারের জন্য ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে মাইকে প্রচারের সময় মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের ভাড়াটে গুন্ডারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন মাহবুব আলম চৌধুরী, ছাত্র ফেডারেশন নেতা শহিদ সাবের (একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবী) ও সাহিত্যিক গোপাল বিশ্বাসের উপর হামলা করে। হামলাকারীরা সেদিন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সভাপতিত্বে নির্ধারিত সভাও পণ্ড করে।^{১৩}

এ প্রেক্ষাপটে একই সালের ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে তার ২০ দিন পর অর্থাৎ ৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় ভাষাচুক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ব্যবস্থাপক সভার বিরোধীদলীয় নেতা বসন্ত কুমার দাস সে চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলে নাজিমুদ্দীন সেকথা অগ্রাহ করে বলেন—‘সুপারিশ করতে হলে তা গভর্নরের মাধ্যমেই করতে হবে’। তিনি চুক্তির কথা উল্লেখ করে আরো বলেন—

‘ভাষার এই প্রশ্নটি মি: দত্ত এবং তার পার্টির কয়েকজন এখানে উত্থাপন করেছেন। তাঁরা ১৫ মার্চের সেই তারিখটির এবং আমি যে চুক্তি করেছিলাম, তা রেখেছেন। কিন্তু ২১ মার্চ অথবা ২৪ মার্চ যা ঘটেছিল, তার সবকিছু ভুলে গেছেন। তারা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত, তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিও অনুগত; কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান যা বলেন, তার কিছুই তাঁদের মনে থাকে না।’

তিনি জিন্নাহর ঘোষণার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন—

‘পাকিস্তানের মঙ্গল কীসের মধ্যে নিহিত, সেটা অন্য যে কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কায়েদে আজমই যে বেশি বোঝেন, এ কথাও আমি তাদের বিবেচনা করতে বলি। যে ব্যক্তি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও গঠন করেছেন, তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্রের স্বার্থেই তা করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও এই ভাষার প্রশ্নটি যে এখানে আনা হয়েছে, সেটা আমার পক্ষে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।’

পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার জন্য প্রথমই একটি প্রস্তাব পেশ করেন। সম্ভবত সেটিই ছিল সরকারি প্রস্তাব। প্রস্তাবে বলা হয়:

ক. পূর্ববাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

খ. পূর্ববাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হলেও বিরোধী দলীয় কংগ্রেস নেতা বসন্তকুমার দাস প্রস্তাবটির ওপর আলোচনার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। একদিন মূলতবির পর ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় সভার কাজ পুনরায় শুরু হলে প্রথমেই বিরোধী দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সরকারি প্রস্তাবের ওপর নিম্নলিখিত সংশোধনী পেশ করেন—

১. এই পরিষদের অভিমত হল এই যে—

ক) বাংলা পূর্ববাংলা প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে গৃহীত হইবে;

খ) পূর্ববাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে;

গ) পূর্ববাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

২। এই পরিষদ আরো মনে করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত;

৩। এই পরিষদ পাকিস্তান সরকারের নিকট সুপারিশন করে যে—

ক) সর্বপ্রকার নোট ও টাকা পয়সা, টেলিগ্রাফ, পোস্টকার্ড, ফর্ম, বই ইত্যাদি ডাক সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস, রেলওয়ে টিকিট এবং পাকিস্তান সরকারের অন্য সর্বপ্রকার সরকারি ও আধা-সরকারি ফার্মে অবিলম্বে বাংলা প্রচলন করা হউক;

খ) কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগদানের জন্য সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম এবং অন্যতম বিষয় হিসেবে বাংলা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং

৪। এই পরিষদ সংবিধান সভার সকল সদস্যকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং পূর্ববাংলার প্রতিনিধিদের নিকট বিশেষভাবে আবেদন করিতেছে, যাহাতে তাহারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য আবদুল বারী চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ, অর্থ দফতরের মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সবুর খান, শামসুদ্দিন আহমদ খোন্দকার, প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন প্রমুখ। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন তার দল কংগ্রেস এর হিন্দু সদস্য বসন্ত কুমার দাশ, বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী, সতীন্দ্রনাথ ভদ্র, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, মনোরঞ্জন ধর, পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত,

প্রেমহরি বর্মা, প্রভাষ লাহিড়ী ছাড়া আর কোনো পূর্ব বঙ্গীয় প্রতিনিধির সমর্থন পায়নি। ফলে সংশোধনী প্রস্তাবটি সাম্প্রদায়িকতায় গিয়ে পৌঁছায়। প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যাওয়ার পর পরিষদের অনুমতি নিয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম প্রস্তাবের চতুর্থ অংশ বাদ দিয়ে তিনি তার দ্বিতীয় প্রস্তাব পেশ করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও বাতিল হয়ে গেলে তৃতীয় ও শেষ প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথম প্রস্তাবের প্রথম অংশটি সামান্য পরিবর্তন করে তিনি শেষ প্রস্তাবটি পেশ করেন—

১। এই পরিষদের অভিমত যে,

(ক) বাংলা পূর্ববাংলা প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে গৃহীত হইবে।

(খ) দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) পূর্ববাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

দীর্ঘ বক্তৃতা শেষে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে পরিষদের কাছে আবেদন করেন বলেন—‘৭ কোটি বাঙালির মধ্যে ৪ কোটির উপর পাকিস্তানী রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া যুক্তিসঙ্গত, এইজন্য আমি এই দাবি উত্থাপন করেছিলাম। আমি আশা করি, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং জনগণের প্রতিনিধি যারা আছেন তারা জনগণের এই দাবি সমর্থন করিবেন এবং নিজেরাই এই প্রস্তাব করিবেন। শুধু বাংলায় বক্তৃতা করলে চলিবে না। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।’

পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী দলীয় নেতা বসন্ত কুমার দাস আরেকটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। সেটি হলো:

(ক) পূর্ববাংলা প্রদেশের সকল অফিস এবং আদালতে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা সরকারি ভাষা হিসেবে গৃহীত হইবে এবং

(খ) পূর্ববাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বাঙালিদের শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।^{১৪}

১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ এর মূলতবি অধিবেশনে বাংলাকে (পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা না করে) কেবলমাত্র পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রীর ইতোপূর্বে স্বাক্ষরিত ৮ দফা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে আরবি হরফে বাংলা লেখার অদ্ভুত সুপারিশ করে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড। যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ে আরবী হরফের বাংলার প্রতিরোধ আন্দোলন। পালিত হয় ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচী।

সারাদেশের প্রদেশের ন্যায় রামুতেও পালিত হয় ছাত্র ধর্মঘট। ১১ এপ্রিল মো. বদরুজ্জামানের (১৯৩০-২০০৮) নেতৃত্বে রামু খিজারী বিদ্যালয় থেকে মিছিল সহকারে বের হয়ে রামু চৌমুহনীতে জনসভায় মিলিত হয়। ওই সভায় ওবায়দুল

হক (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ফতেখাঁরকুল ইউনিয়ন কাউন্সিল), আফসার কামাল চৌধুরী, নুরুল ইসলাম হেলালী, রসিক চন্দ্র বড়ুয়া, জাকের আহমদ (গর্জনীয়া), আমিরুল কবির চৌধুরী, মোশতাক আহমদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।^{১৫} ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে কক্সবাজারের অন্য কোথাও সক্রিয় অবদান আছে কিনা তা জানা যায়নি।

এরপরে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গটির কথা তেমন ভাবে না উঠলেও ১৯৪৯ সালের দিকে শুরু হয়ে চট্টগ্রামে সামান্য আন্দোলন চলে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ গঠিত পূর্ব বঙ্গভাষা কমিটি ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাঙলার বিদ্যালয়সমূহে উর্দুকে সরকারি ভাষা করায় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ সভা, ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান সফরে আসলে উর্দুর কথা বলায় তাকে অপমানসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মূল আঘাতটি আসে ১৯৫২ সালে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৫ মার্চ স্বাক্ষরিত ৮ দফা চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগের সম্মেলনে পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় ঘোষণা করেন—‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে একমাত্র উর্দু’ এবং ‘উর্দু হরফে বাংলা লিখনের প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হইতেছে’। তার এ বক্তব্যে পূর্ব পাকিস্তানে জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর প্রতিবাদে ২৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের এক প্রতিবাদ সভা হয়। ৩০ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতীকী ধর্মঘট পালন করে এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সহযোগে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ওই দিন নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদে পূর্ব পাক মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে বার লাইব্রেরি হলে আহুত সর্বদলীয় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, খেলাফত রব্বানী পার্টি, যুব সংঘ, তমদুন মজলিস, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে আরাবিয়া, মোহাজের সমিতিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সর্বদলীয় সভায় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা এবং কেন্দ্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী থাকতে ১৫ মার্চ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যে ৮ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তা ভঙ্গ করায় নিন্দা প্রকাশ করা হয় এবং অনতিবিলম্বে ভাষা সম্পর্কিত তার উক্তির প্রত্যাহারপূর্বক বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে

নেওয়ার দাবি জানানো হয় এবং উর্দু হরফে বাংলা লেখার চক্রান্তের বিরুদ্ধেও এক প্রস্তাবে সরকারকে হুশিয়ারী করে দেয়া হয়।^{১৬}

সংগ্রাম পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ, ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পতাকা দিবস পালন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় সভা, সমাবেশ, মিছিল ও হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করে। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এ লক্ষ্যে ছাত্র-জনতার মধ্যে লাগাতার প্রচারণা শুরু করে। এই দিকে পূর্ব পাকিস্তান সরকার এতে বিচলিত হয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বুধবার বিকেলে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস.এইচ.কোরাইশী এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করে সভা-সমাবেশ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করে। নির্দেশে বলা হয়—

‘যেহেতু এটা দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের একটি অংশ ঢাকা শহরে জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করার চেষ্টা করছে এবং যেহেতু, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি যে সেই ধরনের শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল জনসাধারণের জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারে, তাই আমি, এস.এইচ. কোরাইশী সি.এস.পি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সি. আর.পি.সি-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী কোতোয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, রমনা ও তেজগাঁও পুলিশ স্টেশন নিয়ে গঠিত ঢাকা শহরের সমগ্র এলাকায় আমার লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ থেকে ত্রিশ দিনের জন্য সেই ধরনের সকল জনসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি।’^{১৭}

পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারা জারির প্রেক্ষিতে ছাত্ররা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৪৪ ধারা জারি ভঙ্গ করে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে সমবেত হয় এবং তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মিছিল নিয়ে ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে। পশ্চিমধ্যে পাহারারত পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ উপেক্ষা করে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনকে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গনে পৌঁছলে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ক্লাসের ছাত্র মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন (অবশ্য সালাহ উদ্দিন নামে কোনো ছাত্র শহীদ হয়নি বলে ভাষা ইতিহাস গবেষক ও ভাষা আন্দোলনকারীরা তাদের স্ব-স্ব-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক লিখিত ‘ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য’ নামক গ্রন্থে যুক্তির মাধ্যমে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র এবং বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের পুত্র রফিকুদ্দীন (১৯৩২-১৯৫২) কে সালাহ উদ্দিন নামে উল্লেখ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং ওই সময়ের বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগারিক মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক এর জবানী উল্লেখ করার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তাতে

উল্লেখ করা হয়েছে, ‘আজাদ পত্রিকার কল্যাণে সালাহ উদ্দীনের শাহাদাত বরণের খবর প্রকাশিত হবার পর জনাব সালাহ উদ্দিন সশরীরে তার কর্মস্থলে এসে সবার সাথে দেখা করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে^{১৬}) ঘটনাস্থলে নিহত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুল জাক্বার (৩০), আবুল বরকত (২৫), নবাবপুর রোডের রাজমিস্ত্রি হাবিবুর রহমানের ছেলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অহিউল্লাহ, সলিমুল্লাহ মোছলেম হলের ছাত্র আনোয়ারুল এছলাম (২৪), জগন্নাথ কলেজের ছাত্র এ আর ফৈয়াজ (১৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সিরাজুদ্দীন খান (২২), সরকারি শুল্ক বিভাগের পিয়ন আবদুস সালাম (২৭), এলাহী বখশ (৪০), মনসুর আলী (১৬), বহিরুদ্দীন আহমদ (১৬), তাজুল এছলাম (২২), মাছুদুর রহমান (১৬), আবদুস সালাম (২২), আখতারুজ্জামান (১৯), এ রেজাক (১৭), মোজাম্মেল হক (২৩), সুলতান আহমদ (১৮), এ রশিদ (১৪), মোহাম্মদসহ বহু সংখ্যক ছাত্র ও পথচারী আহত হয়।

পরে ওই দিন রাতে আবদুল জাক্বার (৩০), আবুল বরকত (২৫), নবাবপুর রোডের রাজমিস্ত্রি হাবিবুর রহমানের ছেলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অহিউল্লাহ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান এবং দৈনিক আজাদ’র ৮ এপ্রিল ১৯৫২-সংখ্যার সংবাদ অনুযায়ী, ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে পুলিশের গুলিতে আহত সরকারি শুল্ক বিভাগের পিয়ন আবদুস সালাম (২৭) প্রায় দেড় মাস চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী সফিউর রহমান নবাবপুর রোড হয়ে কাজে যাওয়ার পথে পুলিশের গুলিতে আহত হয়। ওই দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডা. এ্যালিনসন এর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টায় মারা যান।

এ খবর সারা দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন চলাকালে পরিষদ হতে আজাদ সম্পাদক ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১৯০০-১৯৮৬) লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি হতে ও ঢাকায় ১৪৪ ধারার প্রবর্তন এবং ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য আহমদ হোসেন, খয়রাত হোসেন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি এবং প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির পদ থেকে এস্তেফা দেন। এ সময় পূর্ববাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম ও কংগ্রেস দলীয় ১২ জন সদস্য ওয়াকআউট করেন। তার মধ্যে খয়রাত হোসেন (১৯১১-১৯৭২), রাজশাহীর মনির উদ্দিন আখন্দ, আলী আহমদ খান, আলী আহমদ চৌধুরী, মোবারক আলী, বসন্ত কুমার দাশ, শামসুদ্দিন আহমদ, আহমেদ কবীর চৌধুরী, মনোরঞ্জন ধর, আহমেদ

হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, কক্সবাজারের এমএলএ কবির আহমদ চৌধুরী অন্যতম।^{১৭}

২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় রক্তপাতের খবর পেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী জুরে আক্রান্ত সাহিত্যিক ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে ছাত্র ফেডারেশন কর্মী ননী ধর এর সহায়তায় ‘কাঁদতে আসেনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি’ কবিতা রচনা করেন। এ কবিতাটি বাংলার ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম রচিত কবিতা। কবিতাটি কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে ছেপে বের করা হয় বিলি করতে। কিন্তু সরকার কবিতাটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করায় গোপনে রাতারাতি ছাপিয়ে প্রেস ম্যানেজার কম্পোজিটর ও মেশিনম্যানরা জনগণের ক্ষোভের বাস্তবরূপ দান করে। কবিতাটি প্রকাশ করার দায়ে কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস বন্ধ করার আদেশ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি দবির উদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান সরকার। বিচারে তার ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পর মুক্তি পান।

কক্সবাজার

রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি এবং ছাত্র নিহত ঘটনার খবরটি প্রথম কক্সবাজারে আসে টেলিফোনের মাধ্যমে কক্সবাজার মহকুমা প্রশাসক মৌলভী গফুরুজ্জামান চৌধুরীর বাসায়। ওই টেলিফোন সেটের একটি সংযোগ ছিল কক্সবাজার সিএণ্ডবির প্রকৌশলী এস আর খানের বাসায়। সেই সুবাদে মহকুমা প্রশাসকের সাথে এ সম্পর্কিত বিষয়ে এস আর খান আলাপ করার সময় তার ভাগিনা কক্সবাজার ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র খালেদ মোশাররফ (পরবর্তীতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, কে ফোর্সের অধিনায়ক এবং স্বাধীনতাভোর বাংলাদেশের সেনা প্রধান) শুনে ফেলেন। তিনি যথারীতি ২২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার (ওই সময় সাপ্তাহিক ছুটি ছিল রবিবার) স্কুলে গিয়ে তার সহপাঠী ও স্কুলের ছাত্রদের জানালে ছাত্রদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সকাল ১০টার দিকে খালেদ মোশাররফ ও একই ক্লাসের ছাত্র আবদুল মাবুদ এখলাছী ও নুরুল হুদা চৌধুরী (স্বাধীনতার সময় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেন এবং ক্যাপ্টেন ফরহাদ হত্যার নেতৃত্ব দেন) এর নেতৃত্বে ছাত্ররা কাস বর্জন করে নিহত ও রাষ্ট্রীয় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১০ম শ্রেণির ছাত্র আবুল মাবুদ এখলাছী নিজের হাতে স্কুলের ঘন্টা বাজিয়ে বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় মিছিলরত অবস্থায় গুলি করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মিছিলে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। এ সময় ছাত্ররা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে মিছিল সহকারে কক্সবাজার শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাহারছড়ায় গিয়ে জনসভা করে। একটি ভাগের নেতৃত্ব দেন খালেদ মোশাররফ। খালেদ

মোশাররফের নেতৃত্বে মিছিলে অংশ নেন নুরুল হুদা চৌধুরী (বদরমোকাম), আকতারুজ্জামান চৌধুরী (তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মৌলভী গফরুজ্জামান চৌধুরীর ছেলে), আবদুল মাবুদ এখলাছী (চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আদালত ও কক্সবাজার মহকুমা আদালতের আইনজীবী মৌলভী এখলাছুর রহমানের ছেলে), ৯ম শ্রেণির ছাত্র নুর আহমদ (এডভোকেট, সাবেক এমএনএ), এস এম রফিক উল্লাহ (বড় মহেশখালী), শামসুল হুদা (পেতাসওদাগর পাড়া), ওসমান গণি (মহেশখালী), জালাল আহমদ (নতুন বাহারছড়া), আবদুর রহমান (টেকপাড়া), টেকপাড়ার কামাল উদ্দিন, প্রভাস রক্ষিত, নিখিলেশ্বর চক্রবর্তী (অগ্নিযুগের বিপ্লবী জ্যোতিষ্বর চক্রবর্তীর ছেলে এবং চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বকারী শহীদ শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর ভাইপো, বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী), নাসির উদ্দিন (তৎকালীন কক্সবাজার রেঞ্জ অফিসারের ছেলে) প্রমুখ। কক্সবাজার হাই স্কুলের ছাত্র সালামত উল্লাহ (১৯৭১ সালে স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়ায় ঘৃণিত হন এবং কক্সবাজার মহকুমা শাস্তি কমিটির অফিস সেক্রেটারী ছিলেন) ও আমিরুল কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৫০-২০০ জন ছাত্রের অপর দলটি দক্ষিণ বাহারছড়া হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ এবং পথে সভার আয়োজন করে। এ মিছিল ও সমাবেশে আবদুল কাদের (পরবর্তীতে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক), মোহাম্মদ মুসলিম, আবুল কাসেম (পরবর্তীতে লাইসম্যান), জয়নাল আবেদিন (বাহারছড়া), সগীর আহমদ (নুনিয়ারছড়া), মোজাম্মেল হক (খুরুস্কুল), ওয়াহিদুল আলম (টেকপাড়া), মোস্তাক আহমদ (টেকপাড়া), গুরা মিয়া (তহসিলদার, চৌফলদন্ডী), গোলাম আহমদ (বাহারছড়া), আলতাজ আহমদ (কক্সরাঘাট)সহ আরো অনেকে অংশ নেন।^{২০}

খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে ২০-৩০ জন ছাত্রের এ দলটি একটি মিছিল নিয়ে বাহারছড়ায় গিয়ে সালামত উল্লাহ ও আমিরুল কবির চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সভায় মিলিত হন। উক্ত সভাস্থল থেকে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে তারা সি.এ্যান্ড. বি.এর জনৈক ঠিকাদারকে একটি ট্রাক যোগাড় করে দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি একটি ট্রাক যোগাড় করে দেন। এই ট্রাক নিয়ে ছাত্ররা ‘রক্তের বদলা রক্ত চাই’, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’, ‘ছাত্র হত্যার বিচার চাই’ প্রভৃতি স্লোগান সহকারে কক্সবাজার শহর প্রদক্ষিণ করার পর আবদুল মাবুদ এখলাছী, আখতারুজ্জামান চৌধুরী, নিখিলেশ্বর চক্রবর্তী, আমিরুল কবির চৌধুরী, জালাল আহমদসহ ১৫/১৬ জনের একটি দল ওই ট্রাকে করে রামু হয়ে, ঈদগাঁও হয়ে চকরিয়া পর্যন্ত ট্রাক মিছিল করে। ট্রাক মিছিলেও চলে স্লোগান। ট্রাকটি চকরিয়া গিয়ে মৌলভীর কুমের কাছে গিয়ে আবার কক্সবাজার ফিরে আসে। মাতামুছরী নদীর ভাঙ্গনের ফলে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে আর উত্তর দিকে তথা চকরিয়া হাই স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ট্রাক মিছিল করে ফিরে এসে তারা শহরের

লালদিঘির পাড়ের আহমদ সওদাগরের হোটেলে বসে ভাত খেয়ে যার যার বাড়ি চলে যান। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মৌলভী গফরুজ্জামান চৌধুরী রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে থাকায় ওই সকল মিছিল-সমাবেশে পুলিশ তথা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধা দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন ওই সময়ের ভাষা সৈনিকবৃন্দ। ওই দিন (২২ ফেব্রুয়ারি) বর্তমানে যেখানে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত সেখানে একটি অনির্ধারিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি খুনী নুরুল আমিনের বিচার চাই, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে কক্সবাজার শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ পূর্বক কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরিতে এক জনসভায় মিলিত হন ছাত্ররা। খালেদ মোশাররফের আত্মীয় আইয়ুব আলীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ১০ম শ্রেণির ছাত্র খালেদ মোশাররফ, আবদুল মাবুদ এখলাছী, আকতারুজ্জামান চৌধুরী, কামাল উদ্দিন, ৮ম শ্রেণির ছাত্র আমিরুল কবির চৌধুরী, নুরুল হুদা চৌধুরী, আবদুল কাদের, সালামত উল্লাহ (এডভোকেট), আবদুর রহমান (টেকপাড়া), নিখিলেশ্বর চক্রবর্তী, শামসুল হুদা (ঝিলংজা), ওসমান গণি (মহেশখালী), আবুল কাসেম, নুনিয়ারছড়ার সগীর আহমদ, বাহারছড়ার জয়নাল আবেদিন প্রমুখ।^{২১} পরবর্তী দিক নির্দেশনার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটায় কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খালেদ মোশাররফ, তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মৌলভী গফরুজ্জামান চৌধুরীর ছেলে আখতারুজ্জামান চৌধুরী, নাসির উদ্দিন, আমিরুল কবির চৌধুরী, নুরুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ সমবেত হন। কিন্তু গোয়েন্দা দারোগা আবদুল আউয়াল সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়ে বাধা প্রদান এবং তাদেরকে ধমকাতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে নুরুল হুদা চৌধুরীকে আটক করে। (যদিও পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়) ফলে সভাটি পণ্ড হয়ে যায়।^{২২}

২৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা প্রশ্রুটি অমিমাংসিত রেখে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে ফের পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বক্তব্য এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার পুলিশ জন নিরাপত্তা আইনে এমএলএ মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জি, মনোরঞ্জন ধর, অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের শেষ সাধারণ সম্পাদক, খেলাফত রাক্বানী পাটির আবুল হাশিম, হামিদুল হক চৌধুরীসহ আটজনকে গ্রেফতার করার পর সারাদেশে উত্তাল হয়ে উঠে। সারাদেশের ন্যায় ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ২৫ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকালে কক্সবাজারে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আরো জোরদার করতে ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তথা ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারি বাংলার দাবিতে সরকারি থেকে পদত্যাগকৃত অধ্যাপক ও সাবেক ডাকসু ভিপি ফরিদ আহমদ এর নেতৃত্বে এক

সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় অগ্নিযুগের বিপ্লবী সুরেশ সেন (১৯০৫-১৯৮১), এডভোকেট জ্যোতিষ্মর চক্রবর্তী (১৯০৬-১৯৯৯) প্রমুখের উপস্থিতিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি রুমালিয়ারছড়া এক জন সমাবেশের সিদ্ধান্ত এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি আহুত ৫ মার্চ শহিদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫ মার্চের জনসভা সফল করতে খালেদ মোশাররফ, পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ড সালারে আওয়াল আবদুল হামিদ খান, আফসার কামাল চৌধুরী, আমিরুল কবির চৌধুরী, নুরুল হুদা চৌধুরীসহ ছাত্র জনতা ব্যাপক প্রচারণা চালায়। রামুতে মিছিলোত্তর এক জনসভা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আফসার কামাল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯২)র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জাকের আহমদ, মোশতাক আহমদ, ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী, মনুথ বড়ুয়া, মনির আহমদ, নিউথু মং, থাংলাগ্য, আবুল কাশেম, গর্জনয়ার রশিদ আহমদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন এবং সভায় অচিরেই ছাত্র হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি রুমালিয়ারছড়ায় ফরিদ আহমদ (পরবর্তীতে মৌলভী ফরিদ আহমদ নামে পরিচিত, ওই সময় ফরিদ আহমদ কক্সবাজার কোর্টে ওকালতি করতেন) এর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে খালেদ মোশাররফ, আবদুল মাবুদ এখলাছ, আমিরুল কবির চৌধুরী, সালামত উল্লাহ, নুরুল আজিম চৌধুরী, সিরাজ আহমদ নাজির, নুরুল হুদা চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে রুমালিয়ারছড়াস্থ জনসভায় অংশ নেন। সভায় বক্তব্য রাখেন এডভোকেট সুরেশ সেন, এডভোকেট জ্যোতিষ্মর চক্রবর্তী, ক্রীড়াবিদ বদিউল আলম প্রকাশ বদু মাস্টার, সিরাজ আহমদ, ওবাইদুল হাকিম, অমরেন্দু মজুমদার, মনতোষ কুমার চৌধুরী, এডভোকেট মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।^{১৩}ওই সভা থেকে মিছিল সহকারে রামু চৌমুহনীতে জন সমাবেশে গিয়ে মিলিত হন।

ঢাকা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ডাকা ৫ মার্চ শহিদ দিবস সারাদেশের ন্যায় কক্সবাজারে পালিত হয়। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে খতমে কোরআন, ছাত্র ধর্মঘট, সব দোকান পাট বন্ধ, কোর্ট-অফিস বন্ধ ছিল সেই দিন। কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়, চকরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, রামু থিঞ্জারী বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রধর্মঘট পালনের পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে মিছিল করে। কক্সবাজার শহরে কাছারী পাহাড়ে ১৯৩০ সালে সংঘটিত চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও জালালাবাদ যুদ্ধের সাহসী সৈনিক সুরেশ সেন, মৌলভী ফরিদ আহমদ, আয়ুব আলী, বদিউল আলম প্রকাশ বদু মাস্টারের পরামর্শে ছাত্র নেতা খালেদ মোশাররফ, আবদুল মাবুদ এখলাছ, আমিরুল কবির চৌধুরী এর নেতৃত্বে এক প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে কাছারী পাহাড়ে হাজারো ছাত্র জনতার সমাবেশ হয়। ওই সমাবেশে সরকারি দমন পীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানানো হয়। মো.

আইয়ুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুরেশ সেন, জ্যোতিষ্মর চক্রবর্তী, ফরিদ আহমদ, ওবাইদুল হাকিম, খালেদ মোশাররফ, আবদুল হামিদ খান, আবদুল মাবুদ এখলাছ, সগীর আহমদ, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। সভায় প্রদেশের অফিস আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ, গুলিবর্ষণের দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিচার এবং ভাষা আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির দাবি তোলা হয় এবং সভা শেষে কক্সবাজার কাছারী পাহাড় থেকে কক্সবাজার, কাছারী পাহাড় থেকে বাজারঘাটা, বাজারঘাটা থেকে সী-বিচ পর্যন্ত তিনটি সড়কের নাম সালাম, জাকার ও বরকতের নামে নামকরণ করা হয়েছিল বলে ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কক্সবাজার’ নামক এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন ভাষাসৈনিক বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী।

তন্মধ্যে বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা সরণীটি দীর্ঘদিন বেসরকারিভাবে শহিদ ছালাম রোড নামে পরিচিত ছিল। অন্যান্য নামের ফলকগুলো পুলিশ তুলে ফেলেছিল। কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ করে সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রী দেবপ্রসাদ চৌধুরী ছাত্রদেরকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের প্রচুর সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছিল।

আমিরুল কবির চৌধুরী রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে কক্সবাজারে আমাদের আন্দোলন চলাকালে ঢাকা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদ নিয়ে আমি চিঠি পাঠাতাম রামু স্কুলের ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে। সর্ব বিষয়ে আমাদের পরামর্শ দিতেন জ্যোতিষ্মর চক্রবর্তী এডভোকেট, বদিউল আলম মাস্টার প্রমুখ। কক্সবাজার থাকাকালে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সকলের জন্য কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করতাম।’

ঈদগাঁও

কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে ও একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ে ধর্মঘট করে। প্রায় ৮০/৯০ জন ছাত্রের একটি মিছিল ঈদগাঁও এলাকা প্রদক্ষিণ করে জনগণকে ভাষা চেতনায় জাগ্রত করে। ‘ছাত্রহত্যার বিচার চাই, নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতো দেবো না; ‘মাতৃভাষা বাংলা চাই, ছাত্র হত্যার বিচার চাই’ প্রমুখ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে এবং এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র হত্যাসহ রাষ্ট্রীয় জুলুমের প্রতিবাদ এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয় ওই সভা থেকে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন মুসলিম ছাত্র লীগের মহকুমা

নেতা নূরুল আজিম চৌধুরী (জোয়ারিয়ানালা ইউপি চেয়ারম্যান এবং একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষালম্বন করায় ঘৃণিত হন), ছিদ্দিক আহমদ খালভী (পরবর্তীতে পোকখালী ইউপি চেয়ারম্যান) ও সুলতানুল আলম চৌধুরী। মিছিলে অংশ নেন বিদ্যালয় ছাত্র নজরুল ইসলাম চৌধুরী প্রকাশ লেদু মিয়া, গোপাল ভট্টাচার্য (ঈদগাঁও), রাখাল ভট্টাচার্য (বর্তমানে কানাডা প্রবাসী), হৈয়দ নূর ফরাজী (বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা), মোহাম্মদ ইব্রাহিম (বাংলা একাডেমির প্রয়াত পরিচালক), মথুরা বিকাশ পাল (পরবর্তীতে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, কক্সবাজার সরকারি কলেজ), কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য, মোজাফফর আহমদ (পরবর্তীতে ঈদগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য), হৈয়দুল আলম চৌধুরী (১৯৩৭-২০০৩, পরবর্তীতে ডুলাহাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত), সুলতানুল আলম চৌধুরী (পরবর্তীতে ঈদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক), বদিউল আলম (পরবর্তীতে কক্সবাজার প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সভাপতি) প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ। চকরিয়া উপজেলার হারবাং এলাকার আবদুল হামিদ খান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রাক্তন ওসি এবং পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে নেতৃত্বের গুণাবলি এবং মানুষের মন জয় করার অধিকারী হওয়ায় তিনি এ ব্যাপারে ছাত্রদেরকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন এবং তিনি নিজেও ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন।

চকরিয়া

মহকুমার প্রবেশদ্বার উপজেলা হিসেবে পরিচিত চকরিয়ায় যে কোনো আন্দোলনে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমএলএ) তমদ্দুন মসলিস নেতা কবির আহমদ চৌধুরী (পেকুয়া) কক্সবাজার মহকুমার প্রতিনিধিত্ব করতেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনে চট্টগ্রাম ও চকরিয়ায় সবকটি কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছেন। পূর্ববাংলা ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম ও কংগ্রেস দলীয় যে ১২ জন সদস্য ওয়াকআউট করেন তার মধ্যে কক্সবাজারের এমএলএ কবির আহমদ চৌধুরীও ছিলেন। ভাষার প্রশ্নে তার ওয়াক আউট ছিলো এ এলাকার ছাত্র সমাজের জন্য নিয়ামক শক্তি। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রথম খবর চকরিয়া পৌঁছে ২২ ফেব্রুয়ারি।

২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি এবং ছাত্র হত্যা ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২২ ফেব্রুয়ারি চকরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র এস কে শামসুল হুদা, ৯ম শ্রেণির ছাত্র জামাল উদ্দীন আহমদ (পরবর্তীতে রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক এবং চকরিয়া ডায়াবেটিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখের নেতৃত্বে ক্লাস বর্জনপূর্বক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে মিছিল

সহকারে থানা সদরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলে অন্তত ২০০-২৫০ ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিলো। মিছিল শেষে নিকটস্থ ডাকবাংলো মাঠে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা মিছিলে ‘ছাত্রহত্যার বিচার চাই, নূরুল আমিনের ফাঁসি চাই’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতো দেবো না’, ‘মাতৃভাষা বাংলা চাই, ছাত্র হত্যার বিচার চাই’—এসব স্লোগান দেয়। এই মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা হলেন, ১০ম শ্রেণির ফাস্টবয় শাহনওয়াজ আহমদ জাহাঙ্গীর (পরবর্তীতে কক্সবাজার হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক, এডভোকেট এবং কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা), এস কে শামসুল হুদা (পরবর্তীতে চকরিয়া থানা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ছিলেন) সিরাজ উদ্দীন রেজা (শিক্ষক), মোহাম্মদ ইসহাক, নাসির আব্বাস, আমান উল্লাহ, হাবিব উল্লাহ, নাসির উদ্দীন রেজা, মোসলিম উদ্দীন রেজা (পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক, নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম), আনোয়ার হোসেন (পরবর্তীতে ঠিকাদার ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক), রাজা মিয়া (জমিদার মোশতাক আহমদ চৌধুরী পরিবারের সদস্য), কাকারার মাহবুব, ছালামত উল্লাহ, মাহবুব হোসেন, এম. এ গণি (পরবর্তীতে রাজনীতিবিদ), নজির আহমদ (পরবর্তীতে ব্যুরো প্রধান বাসস, চট্টগ্রাম প্রমুখ) এনামুল হক, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আবদুস সালাম (প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে অরসরপ্রাপ্ত), মোহাম্মদ সাকের আহমদ (পরবর্তীতে মাস্টার) প্রমুখ। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক জগবন্ধু বড়ুয়া (চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার বাণীগ্রাম এলাকার বাসিন্দা) ছাত্রদেরকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছিলেন।

ওই দিনের স্মৃতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জামাল উদ্দীন আহমদ বলেন, কক্সবাজার হাই স্কুল থেকে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বকারী খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে জালাল আহমদ, নূরুল হুদা চৌধুরী, এডভোকেট সালামাত উল্লাহ, আমিরুল কবির চৌধুরী, আখতারুজ্জামান চৌধুরী, নাসির উদ্দিনসহ ২০-৩০ জন ছাত্রের এ দলটি সি.এ্যাভ.বি.এর জনৈক ঠিকাদারকে একটি ট্রাক যোগাড় করে দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি একটি ট্রাক যোগাড় করে দেন। এই ট্রাক নিয়ে ছাত্ররা ‘রক্তের বদলা রক্ত চাই’, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’, ‘ছাত্র হত্যার বিচার চাই’ প্রভৃতি স্লোগান সহকারে কক্সবাজার শহরে প্রদক্ষিণ করার পর রামু, ঈদগাঁও হয়ে চকরিয়া আসেন বিকেল ৩-৪টার দিকে। উনারা আসলে চকরিয়া হাই স্কুল মাঠে অবস্থানরত ছাত্রদের নিয়ে আমরা মিছিল সহকারে তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং তাদের সাথে মিছিলে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানাই। মিছিলোত্তর সমাবেশে খালেদ মোশাররফ, নূরুল হুদা চৌধুরী, ছালামত উল্লাহ, শাহনওয়াজ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, সিরাজ উদ্দীন রেজা, জামাল উদ্দীন আহমদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। পরে সন্ধ্যায় পুনরায় তারা কক্সবাজারে ফিরে যায়।^{২৪}

এছাড়া চকরিয়া উপজেলার আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা আজিজুর রহমান (প্রকাশ লাল আজিজ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পিডিপিতে যোগদান করে নির্বাচন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চকরিয়া শান্তি কমিটির অন্যতম সদস্য গ্রহণ করে বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান করায় ঘৃণিত হন) ওই সময় তমদুন মজলিস চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্য হিসেবে চট্টগ্রাম, পটিয়া, সাতকানিয়া, হাতিয়া, নাজিরহাট, চকরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলন, সেমিনার ও সমাবেশে সক্রিয় অবদান রাখতেন।

পেকুয়া

পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটের ছাত্ররাও রাজধানী ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে ২২ বা ২৩ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল, বিক্ষোভ সমাবেশ, ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। এ খবরটি জানার পর পেকুয়ার জমিদার আবদুল আজিজ চৌধুরীর ছেলে মাহমুদুল করিম চৌধুরী (১৯৩৮-২০০৬)সহ অন্যান্য ছাত্ররা পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটে ক্লাস বর্জনপূর্বক মিছিল নিয়ে বের হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং ছাত্রহত্যার নিন্দা ও বিচার দাবি জানানো হয় ওই মিছিল-সমাবেশে। পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটের ৮ম শ্রেণির ছাত্র মাহমুদুল করিম চৌধুরী জমিদারপুত্র হওয়ায় তারই নেতৃত্বে শুরু হওয়া ছাত্র ধর্মঘটে অংশ নেন ওই স্কুলের ছাত্র জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, কামরুল ইসলাম চৌধুরী প্রকাশ কামাল চৌধুরী, আবুল কাসেম চৌধুরী (বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা জিএম চৌধুরীর দৌহিত্র), ওই স্কুলের ৮ম শ্রেণির ছাত্র এবং ছাত্র মনিটরের এজিএস এম এ শুকুর (পরবর্তীতে টেকনাফ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও উখিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক), আবুল বশর (এডভোকেট, সদ্য প্রয়াত), আবদুল মজিদ (অধ্যক্ষ, পাহাড়তলী কলেজ, চট্টগ্রাম), মোহাম্মদ ইদ্রিস প্রমুখ।

এম এ শুকুর স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তিনি স্কুলের এজিএস ছিলেন। একই সাথে তিনি নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘১৯৫২ সালে আমি অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হই। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মাহমুদুল করিম চৌধুরী (সাবেক সাংসদ), আবদুল মজিদ, মোহাম্মদ ইদ্রিস, কামরুল ইসলাম চৌধুরী প্রকাশ কামাল চৌধুরী, জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, আবুল কাসেম চৌধুরী (বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা গোরা মিয়া চৌধুরী প্রকাশ জিএম চৌধুরীর দৌহিত্র এবং এমএলএ কবির আহমদ চৌধুরীর ছেলে)। ২১ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভাষার দাবিতে আন্দোলন করে। ছাত্রদের মিছিলে

পুলিশ গুলি ছুঁড়লে অনেক ছাত্র শহিদ হয়। এ খবর একদিন কি দুইদিন পরে অর্থাৎ ২২ বা ২৩ ফেব্রুয়ারি পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটে এসে পৌঁছে। খবর পেকুয়া এসে পৌঁছার সাথে সাথেই আমরা ক্লাশ থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের সহপাঠি মাহমুদুল হক চৌধুরী এলাকার জমিদারের ছেলে। জমিদারের ছেলে হিসেবে তার নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা ছিলো। মাহমুদুল করিম চৌধুরী পূর্ব থেকেই বাম রাজনীতির সাথে পরিচিত ও জড়িত ছিলেন। ফলে মাহমুদুল করিম চৌধুরীসহ আমরা স্কুলের মাঠে সমবেত হই। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আমরা বিদ্যালয় মাঠেই সমাবেশ করি এবং এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। সমাবেশে অনেকেই বক্তব্য প্রদান করেন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিদ্যালয় থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় এক মাইল ও পশ্চিম দিকে পেকুয়া বাজার পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে আবার স্কুলে ফিরে আসি। ‘ছাত্রহত্যার বিচার চাই, নূরুল আমিনের ফাঁসি চাই’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতো দেবো না’, ‘মাতৃভাষা বাংলা চাই, ছাত্র হত্যার বিচার চাই’ স্লোগান দিয়ে পর পর দুইদিন আমরা ছাত্রদের নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করি। দুই দিন ধরে স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ ছিলো। এসময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি এলাকার আনোয়ারুল আজিম চৌধুরী। স্কুলের কোনো শিক্ষকই ছাত্রদের বিক্ষোভ সমাবেশে বাধা প্রদান করেননি। শিক্ষকদের মৌন সমর্থন না থাকলে আমরা বিদ্যালয় থেকে বের হতে পারতাম না, ছাত্রদের নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে পারতাম না, পারতাম না বিক্ষোভ মিছিল করতে। যদিও এলাকার দু’একজন শিক্ষিত লোকজন আমাদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ নিয়ে নাক ছিটকায়। তবে তাদেরকে আমরা আমলে নিই নি।’ ২৫

কুতুবদিয়া

কুতুবদিয়া উপজেলা চট্টগ্রাম শহরের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র হত্যার খবরটি কুতুবদিয়ায় পৌঁছায় ২২ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন চট্টগ্রাম থেকে আসা এ কে খান স্টিমার থেকে সাপ্তাহিক ইন্ডোফাক পত্রিকার মাধ্যমে এ খবরটি পায়। তৎক্ষণাৎ ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে কুতুবদিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও ধুরং হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা। কুতুবদিয়া হাই স্কুলের ৯ম শ্রেণির ছাত্র মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা ও দৈনিক কক্সবাজারের সম্পাদক) জানিয়েছেন এ তথ্য।

তিনি সেই স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ২২ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিনের মতো বড়ঘোপ স্টীমার ঘাটে গিয়ে চট্টগ্রাম থেকে আসা এ

কে খান স্টীমারে গিয়ে তখনকার সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (পরবর্তীতে দৈনিক ইত্তেফাক) আনতে গিয়ে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির মিছিলে পুলিশের গুলি ও ছাত্র হত্যার খবরটি দেখা মাত্র কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে স্কুলের বড় ভাই এবং সহপাঠী বন্ধুদের বলি এবং তাদের সম্মতিতে আমি নিজেই স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ক্লাস বর্জন করে মিছিলে যোগদান করার আহ্বান জানাই ছাত্রদেরকে। ১০ম শ্রেণির ছাত্র এস কে মকবুল আহমদ, শামসুল হুদা সিদ্দিকী, সিরাজুল ইসলাম ও আমার নেতৃত্বে স্কুলের ছাত্ররা খবরটি লুফে নিয়ে প্রায় ২ শতাধিক শিক্ষার্থী কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, ‘খুনী আমিনের ফাসী চাই’ স্লোগানে স্লোগানে বের হয়ে বর্তমানের থানা কম্পাউন্টসহ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কুতুবদিয়া হাই স্কুলের সমবেত হই। এ দিকে ধুরং হাই স্কুলের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন আহমদ এর নেতৃত্বে অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী ক্লাস বর্জন করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে আমাদের হাই স্কুলের সামনে সমবেত হয়। পরে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস কে মকবুল আহমদ, ৯ম শ্রেণির ফাস্ট বয় মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, আমি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, ধুরং হাই স্কুলের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন আহমদ, (পরবর্তীতে ধুরং হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং একান্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন কুতুবদিয়ায় সংঘটিত ঘটনায় পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার ২০ নং আসামী), মোসলেম উদ্দিন চৌধুরী, শামসুল হুদা সিদ্দিকী, হালেহ আহমদ চৌধুরী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান) প্রমুখ। ওই সমাবেশে ছাত্র হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়। ওই সময় কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জালাল আহমদ চৌধুরী (১৯১৮-১৯৮৯) যথেষ্ট সহায়তা করেন বলে জানান তিনি।^{২৬}

ওই মিছিল ও সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন, এস কে মকবুল আহমদ, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, রাখাল চন্দ্র নাথ, রেজা শাহ মোসলেম উদ্দিন চৌধুরী, শামসুল হুদা সিদ্দিকী, মোসলেম খান (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা)। তবে প্রায় ২ শতাধিক শিক্ষার্থী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি পথসভাও হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে। ওই পথসভায় সকল ছাত্র হত্যার বিচার এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার জোর দাবি জানানো হয়।

ওই সময় ‘আউলিয়ার দেশ কুতুবদিয়া’ গ্রন্থের প্রণেতা রশিদ আহমদ (১৯২০-?) ধুরং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বাংলার দাবিতে মিছিল-সমাবেশে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাছাড়া তিনি ১৯৪৭ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও, ঢাকা স্টেশনে প্রোগ্রাম সেক্রেটারী হিসেবে যোগদান

করেন। ১৯৪৮ সালে মৌলভী ফরিদ আহমদের প্রভাবে সরকারি চাকুরিতে ইত্তেফাক দিয়ে নিজ থানা কুতুবদিয়ায় ফেরত আসেন বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

ওই সময় পূর্ব বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সভা এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ নেতা কবি ধীরেন শীলও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যিনি পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য ৫৮ দিন জেলে অনশন করেছিলেন। এ তথ্য সরদার ফজলুল করিমের ‘অনশনে আত্মদান’ বইয়ে উল্লেখ আছে।

রামু

ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গুলি, ছাত্র হত্যার খবরটি রামুতে পৌঁছে ২৩ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন রামু খিজারী হাই স্কুলের অস্টম শ্রেণির ছাত্র প্রতিনিধি মোশতাক আহমদ (প্রফেসর) এর নিকট চিঠি দেন কক্সবাজারের সালামত উল্লাহ ও আমিরুল কবির চৌধুরী।^{২৭} চিঠির নির্দেশ মতে মোশতাক আহমদ ছাত্রদেরকে একত্রিত করে। ঢাকার ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এবং ভাষার দাবিতে ছাত্ররা স্কুলে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৫০-২০০ ছাত্রের একটি মিছিল রামুর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলে জাকের আহমদ (গর্জনীয়া), মোশতাক আহমদ, ফজলুল করিম (পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক ও ভারুয়াখালী ইউপি চেয়ারম্যান), অনমদর্শী বড়ুয়া (লন্ডন প্রবাসী), ওবাইদুল হক (১৯৩২-২০০৭), ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী (১৯৩৭-২০১০), মনির আহমদ, মনুখ বড়ুয়া (পরবর্তীতে বৌদ্ধ নেতা ও সাংবাদিক), নিউথু মং, থাংলাগ্য, ক্যাথিন প্রমুখ ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এই মিছিলে সাধারণ জনগণের মৌন সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্র বিকাশ বড়ুয়া, নরেন্দ্র দস্তিদার (বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ভাই), আবুল কাশেম মাস্টার (খুরস্কুল, ১৯৭০ সালে কক্সবাজার মহেশখালী প্রাদেশিক আসনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে হেরে যান) ছাত্রদেরকে প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেন। আবুল কাশেম ১৯৫২ সালে দক্ষিণ মিঠাছড়ি জুনিয়র হাইস্কুলের চাকরি থেকে ইত্তেফাক দিয়ে রামু খিজারী হাইস্কুলে যোগদান করেন। মিঠাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন আবুল কাশেম ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ‘দৈনিক আযাদ’ পত্রিকার সম্পাদক ও এম, এল, এ আবুল কালাম শামশুদ্দীন পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করায় তাকে টেলিগ্রাম মারফত একটি অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেছিলেন বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়।

উখিয়া

কক্সবাজার জেলার দক্ষিণের উপজেলা উখিয়া ও টেকনাফ। সর্বদক্ষিণের উপজেলা টেকনাফে ১৯৫২ সালে কোনো উচ্চ বিদ্যালয় ছিলো না। টেকনাফে তখন ছিলো মাত্র একটি এম ই বিদ্যালয়। তাও খুব বেশি সুবিধের ছিলো না। এছাড়া দক্ষিণের অপর উপজেলা উখিয়া। উখিয়া সদরে তখন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উখিয়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কোটবাজার (রত্নাপালং) এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো পালং মডেল উচ্চ বিদ্যালয়। পালং মডেল উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনের ঢেউ কক্সবাজার মহকুমার দক্ষিণের উপজেলা উখিয়ার পালং মডেল হাই স্কুলেও এসে আছড়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে গুলিতে ছাত্র হত্যার খবরটি ওই দিন রাত্রেই রেডিও এর মাধ্যমে খবর পায় পালং উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ২২ ফেব্রুয়ারি উখিয়ায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে তৎকালীন উখিয়া টেকনাফের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় পালং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

রাজধানী ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির মিছিলে খুনী নুরুল আমিন সরকারের নির্দেশে গুলি করে ছাত্র হত্যার খবরটি ওই দিন রাত্রে পেয়ে যায়। ২২ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিনের মতো পালং উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে স্কুলের সহপাঠী বন্ধুদের সাথে আলাপ তৎক্ষণাৎ ক্লাস বর্জন করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মিছিল ও উখিয়া থানা ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাদশা মিয়া চৌধুরী ও স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ জকরিয়া (শিক্ষক, বর্তমানে প্রয়াত) এর নেতৃত্বে পালং হাই স্কুলের শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে মিছিল সহকারে আরাকান সড়ক হয়ে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগান দিতে দিতে পায়ে হেঁটে উখিয়া থানা স্টেশনে যায়। এক পর্যায়ে উখিয়া থানায় কর্মরত পুলিশ সদস্যদেরকে বলা হয় যে, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে আপনারা আপনাদের কার্যক্রম বন্ধ করে আমাদের আন্দোলনকে সমর্থন করুন। নতুবা থানা উড়িয়ে দেয়া হবে’। পরক্ষণে থানায় কর্মরত পুলিশ সদস্যরা আমাদের সমর্থন জানালেও উখিয়া স্টেশন ঘুরে এসে দেখি থানার পুলিশ তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা থানায় গিয়ে লাঠি মেরে দরজা বন্ধ করি। অসংখ্য লাঠির আঘাতে থানার দরজা ফাটল হয়ে যায়।’ দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ফাটল দরজা ভাষা আন্দোলনের আলামত হিসেবে বহাল ছিলো। তখন উখিয়া স্টেশনে জনতার উদ্দেশ্যে বাংলার ভাষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাদশা মিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ জাকারিয়া, নিরোধবরণ বড়ুয়া, প্রিয়দর্শী বড়ুয়া, ললিত বড়ুয়া প্রমুখ। ওই সমাবেশে ছাত্র হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়।^{২৮}

এছাড়া মিছিলে ছিলেন, হালেহ আহমদ চৌধুরী (পরবর্তীতে কৃষক লীগ নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন চৌধুরীর পিতা), প্রিয়দর্শী বড়ুয়া, এ কে আহমদ হোসেন (পরবর্তীতে এডভোকেট), আয়ুব আলী, রশিদ আহমদ, আজিজুর রহমান প্রকাশ আজিরান মিয়া (পরবর্তীতে এডভোকেট), তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, ফরিদ আহমদ খান্দকার (পরবর্তীতে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন), আবদুল হক চৌধুরী (পরবর্তীতে উখিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)সহ অনেকেই। সে সময় স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার কাননুগোপাড়া নিবাসী লোকনাথ দে। ছাত্রদের ক্লাশ বর্জন, বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশে শিক্ষকদের মৌন সম্মতি ছিলো।

টেকনাফ

কক্সবাজার মহকুমার সাথে উখিয়া-টেকনাফের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় ঢাকায় ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের মৃত্যুর সংবাদ টেকনাফে পৌঁছে বেশ দেরিতে। ২৬ ফেব্রুয়ারী *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার মাধ্যমে খবর পেয়ে টেকনাক এম.ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অবিনাশ চন্দ্র দে (প্রয়াত), মংনি রাখাইন(প্রয়াত), জৈয়দুর রহমান (প্রয়াত পোস্ট-মাস্টার), মাস্টার আবদুর রবের উৎসাহে ও সহযোগিতায় ছাত্ররা সংগঠিত হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি টেকনাফ এম.ই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ক্লাস বর্জনপূর্বক মিছিল করে টেকনাফ স্টেশন প্রদক্ষিণ করে। এ মিছিলে আলী আহমদ সওদাগর (টেকনাফ বাজার সমিতির নেতা), আবদুর রহমান, বাবু মংনি, আবদুল গণি (পরবর্তীতে টেকনাফ সংগ্রাম কমিটির অন্যতম সদস্য এবং এরশাদ সরকারের আমলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচিত), হালেহ আহমদ মাস্টার, জালাল উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ মিয়া মেইকার, হোছেন আহমদ, নুরুজ্জামান, নুরুল হক (পরবর্তীতে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত ছিলেন), আবদুল মোনাফ, বদিউর রহমান, বাবু সুব্রত, আমির হামজা প্রমুখ ছাত্র অংশ নেন। ছাত্র মিছিলের উৎসাহ ও সহযোগিতা করার দায়ে ৩জন শিক্ষককে বহিস্কার করা হয়। টেকনাফে ২ দিনে ২ টি ছাত্র মিছিলের পরপরই সরকারি দল মুসলিম লীগ নেতা নজির আহমদ চৌধুরী ও আবদুল গফুর চৌধুরীর নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন নস্যাৎ করতে ৪টি সভা করে। সভায় নেতারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন এবং এ ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেন। এ চারটি সভায় উপস্থিত উল্লেখযোগ্যরা হলেন খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরী, মকসুদ আহমদ চৌধুরী, আনোয়ার চৌধুরী, মীর কাসেম চৌধুরী, জাফর আলম চৌধুরী(১৯০৩-১৯৭৭), আবদুর গফুর চৌধুরী (১৯৩০-১৯৯০)

নজির আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। এরা প্রায় সকলেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অবলম্বন করে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেন।^{২৯}

তাহাড়া কক্সবাজারের কৃতিসন্তান ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রতিটি আন্দোলনে শরীক হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী মাহফিল আরা আজমত (১৯২৯-১৯৯৩; তিনি অবিভক্ত বাংলার জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিষয়ক মন্ত্রী খান বাহাদুর জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (১৮৮১-১৯৫৭)’র ভাই কবির উদ্দিন চৌধুরীর মেয়ে)। তিনি ভাষা আন্দোলনের অগ্নিবীরা দিনগুলোতে একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ ছাড়াও ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন লিখতেন এবং ছাত্রীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন মর্মে খবর রটে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙতে তিনি ছাত্রীদের সংগঠিত করার নেতৃত্ব দিয়েছেন অন্যদের সঙ্গে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী ডুলাহাজারার শাহাবুদ্দিন চৌধুরী (পরবর্তীতে চকরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও কক্সবাজার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক)। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে পুলিশ শাহাবুদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ জেল-হাজতে ছিলেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র মো. বদরুজ্জামান (১৯৩০-২০০৮)ও ভাষার মিছিলে অংশ নেন (যার নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে রামুতে জনসভা এবং মিছিল সমাবেশ হয়)।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কক্সবাজারের মতো মফস্বল এলাকার অবদান গৌরবদীপ্ত। কক্সবাজারের আন্দোলন ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো সহিংস না হলেও তা ছিল যথেষ্ট সুসংগঠিত ও জনসমর্থিত।

ভাষা আন্দোলনের সে উত্তাল দিনগুলোতে কক্সবাজারের ভূমিকাকে আঞ্চলিকতার দোহাই দিয়ে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কারণ চট্টগ্রামের অজ্ঞাগার আক্রমণ, জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ নেয়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম দুই বিপ্লবী এডভোকেট সুরেশ চন্দ্র সেন, জ্যোতিষ্মর চক্রবর্তী এবং ভাষা আন্দোলনের পক্ষে প্রথম সরকারি চাকুরিতে পদত্যাগকারী অধ্যাপক মৌলভী ফরিদ আহমদ কক্সবাজারের সন্তান ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণ পরিষদ নির্বাচনে নেজাম ইসলামের পক্ষ থেকে মৌলভী ফরিদ আহমদ দ্বিতীয় বারের মতো গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি আদায়কারীর অন্যতম জাতীয় পরিষদ সদস্য ছিলেন।

আমাদের মানতেই হবে ভাষা আন্দোলনের মহান সৈনিকরা ভাষার মর্যাদা বা সম্মান প্রতিষ্ঠা করলেও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আজো বাস্তবায়িত হয়নি। তাদের উদ্দেশ্য শুধু বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ছিল না। ছিল এ ভাষাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও জীবন ধারার বিকাশও অবশ্যই। যতদিন না বাংলা সংস্কৃতি আর বাঙালির জীবনধারা শতদলে বিকশিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মহান ভাষাসৈনিকদের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হবে না, অন্তত পরিপূর্ণরূপে।

শহিদমিনারের কথা

শহিদমিনার ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় স্মৃতিস্তম্ভ। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে এই স্তম্ভ নির্মিত হয়, যা বর্তমানে ‘শহিদমিনার’ নামে পরিচিত। এই শহিদমিনারে শহিদদের স্মৃতিই কেবল নয়, বেশ কয়েকবার ভাঙচুরের বেদনাও বিদ্যমান। ঢাকায় প্রথম শহিদমিনার নির্মিত হয় এ স্থানেই ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে। ১৯৫২ সালের ঘটনাবলুল ২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারির রেশ ধরে ২৩ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতেও কারফিউ বলবৎ ছিল ঢাকায়। পথে পথে ছিল সেনা প্রহরাও। তবু এরই মাঝে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে অবস্থানরত রাজনীতি সচেতন ছাত্ররা আকস্মিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে একটি মিনার নির্মাণের। সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র বদরুল আলম এই কলেজেরই আরেকজন ছাত্র সাইদ হায়দারের সহায়তায় প্রণয়ন করেন একটি মিনারের নকশা। সেই নকশা অনুযায়ী সেখানে উপস্থিত সর্বসাধারণের যৌথশ্রমে একরাতেই নির্মিত হয় প্রায় সাড়ে দশ ফুট উঁচু এবং ছয় ফুট চওড়া প্রথম শহিদমিনারটি।

পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার, আনুষ্ঠানিকভাবে মিনারটি উদ্বোধন করেন ভাষা শহিদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে মিনারটি উদ্বোধন হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। মিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দৈনিক *আজাদ* সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

বর্তমান শহিদমিনারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শহিদদের রক্তভেজা স্থানে সাড়ে ১০ ফুট উঁচু এবং ৬ ফুট চওড়া ভিত্তির ওপর ছোট স্থাপত্যটির নির্মাণকাজ শেষ হলে এর গায়ে ‘শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ’ লেখা একটি ফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়। নির্মাণের পরপরই এটি শহরবাসীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে; প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রতীকী মর্যাদা লাভ করে। এখানে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমায়। কিন্তু সেই উদ্বোধনের পর মিনারের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব এবং এর চেতনাবিকাশী শক্তির কথা দ্রুত অনুধাবন করে ওই দিনই বিকেলে পুলিশ হোস্টেল ঘেরাও করে গুড়িয়ে দেয়

বাঙালির প্রাণের আবেগজড়িত মিনারটি। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ৯ মে’র অধিবেশনে একুশ দফার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শহিদমিনার তৈরি, একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করে বটে, কিন্তু ওই বছর ৩০ মে সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় তা আইনসিদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মানুষ কালো কাপড়ে ঘিরে রাখে স্মৃতির মিনারের বিদীর্ণ স্থানটি।

প্রথম নির্মিত শহিদমিনারটি এভাবে ভেঙ্গে ফেললেও পাকিস্তানি শাসকরা শহীদের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেনি। সারা দেশে, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনগুলিতে অনুরূপ ছোট ছোট অসংখ্য শহিদমিনার গড়ে ওঠে এবং ১৯৫৩ সাল থেকে দেশের ছাত্র-যুবসমাজ একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিকে ‘শহিদ দিবস’ হিসেবে পালন করতে থাকে। মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদমিনারের শূন্য স্থানটিতে লাল কাগজে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের অবিকল প্রতিকৃতি স্থাপন করে তা কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সেই প্রতীকী শহিদমিনার থেকেই সে বছর ছাত্রদের প্রথম প্রভাতফেরি শুরু হয়। পরের বছরও ছাত্ররা একইভাবে শহিদ দিবস পালন করেন।

স্বাধীনতার পর থেকেই প্রবাসীদের উদ্যোগে বিদেশের মাটিতে শহিদমিনার নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে শহিদমিনার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রতীকস্বরূপ হয়ে ওঠে। বহির্বিশ্বে ১৯৯৭ সালে প্রথম যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গের ওল্ডহ্যামে এবং ১৯৯৯ সালে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে শহিদমিনার নির্মিত হয়। তাছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৫ সালে জাপানের টোকিওতে শহিদমিনার নির্মিত হয়। জাপান-বাংলাদেশ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার সূত্র ধরে বাংলাদেশ সরকার এই শহিদমিনারটি নির্মাণ করে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইতালীসহ বেশ কয়েকটি দেশে শহিদমিনার নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

কক্সবাজারে শহিদমিনার

১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে একুশের ভাষা শহিদদের ফুল দিয়ে সম্মান জানানোর সংস্কৃতি। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানী ঢাকাতে একুশের ভাষা শহিদদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর সংস্কৃতি চালু হলেও প্রান্তিক জেলা কক্সবাজারে তা শুরু হয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর পরে।

১৯৫৯-৬০ সালের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষা দিবস পালন করা হতো। এ সময়ে রামু থেকে ছাত্র প্রভাতফেরি করতে ট্রাকযোগে মহকুমা সদরে আসতেন। তবে ১৯৬১ সালেই সর্বপ্রথম রামুতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষা দিবস পালিত হয়। মহকুমা সদর এবং রামু থানা সদর ছাড়া অন্য কোনো স্থানে এ সময়ে ভাষা দিবস উদযাপনের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। স্বাধীনতার আগপর্যন্ত কক্সবাজার মহকুমায় কোনো শহিদমিনার নির্মাণ হয়নি। শাসকগোষ্ঠীর গোয়েন্দাদের নীরব নির্যাতনের কারণে তা স্থাপন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তবে প্রতিবছর মহকুমা সদরে বিভিন্ন স্থানে অনাড়ম্বরভাবে ভাষা দিবস উদযাপন করা হতো। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মাঠে ভাষা দিবস পালিত হয়। মৌলভী ফরিদ আহমদ, কামাল হোসেন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম চৌধুরীসহ আরো কয়েকজন ছাত্রনেতা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মূলত স্বাধীনতার পরে কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নির্মিত শহিদমিনারটি মহকুমার সর্বপ্রথম শহিদমিনার স্বীকৃত।

তবে এখন তার অস্তিত্ব নেই। ১৯৬৯ সালের দিকে কমরেড ইদ্রিস আহমদ, সুভাষ দাশ, সিরাজুল মোস্তফা প্রমুখ ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় পালের দোকানস্থ শহিদমিনার। যেটি এখন পুরাতন শহিদমিনার নামে পরিচিত। এ শহিদমিনারটি কক্সবাজার পৌর মেয়র ১৮ জুন ২০০৬ সালে নতুনভাবে সংস্কার করেন। এ শহিদমিনারে ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা প্রথম একুশের পালন করে করে বলে জানিয়েছেন কমরেড ইদ্রিস আহমদ।

তবে কেন্দ্রীয়ভাবে শহিদ দিবস পালনের জন্য কোনো চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধে কক্সবাজারের বহু মানুষ শহিদ হয়েছেন। তাদের জন্য কোনো স্মৃতি ফলক বা স্মৃতিস্তম্ভ করা হয়নি। স্বাধীনতা যুদ্ধে কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের বশির আহমদ ও মাস্টার শাহ আলম নামে ২ জন শিক্ষক শহিদ হওয়ায় মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ ছাত্রদের চৈতন্যের মধ্যে আশায় তারা উদ্যোগী হন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি আমরা শহিদমিনার নির্মাণের জন্য জায়গা এবং অনুমতি প্রদানের জন্য তৎকালীন প্রধান শিক্ষক আবদুল কাদের অনুরোধ করে মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে। প্রথমে সরকারি অনুমতি ছাড়া শহিদমিনার নির্মাণের অনুমতি প্রদানে আবদুল কাদের অপারগতা প্রকাশ করায় ছাত্রনেতা কামাল হোসেন চৌধুরী প্রমুখকে দিয়ে অনুমতি প্রদানে রাজি করানো হয়।

১৮ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে প্রধান শিক্ষক আবদুল কাদেরের সভাপতিত্বে শিক্ষক পরিষদ এবং পরবর্তীতে ছাত্রদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বকারী

ছাত্র এবং প্রধান শিক্ষক আবদুল কাদেরকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি ‘শহিদমিনার ও স্মৃতিস্তম্ভ’ নির্মাণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন—মাস্টার আবদুল রাজ্জাক, বদরুল আলম, সৈয়দ আহমদ, সুগত বড়ুয়া, দ্বীননাথ রায়। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন—মো. আলী, আলতাফ হোসেন, মুজিবুর রহমান, আবদুল কাদের, কবির আহমদ, সমীর পাল, খোরশেদ আলম, বিপুল সেন ও বিশ্বজিত সেন বাধু। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সামাদকে দিয়ে জাতীয় শহিদমিনারের আদলে একটি শহিদমিনার এবং স্মৃতিস্তম্ভের ২টি নকশা তৈরি করা হয়। স্মৃতিস্তম্ভ দুটি হল স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শহিদ শাহ আলম ও শহিদ বশির আহমদের জন্য। তারা দু’জনই ঢাকায় বি.এড প্রশিক্ষণরত অবস্থায় ১৯৭১ সালে ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। তাদের স্মৃতিস্বরূপ কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনের নাম ‘শহীদ শাহ আলম-বশির আহমদ মিলনায়তন’ নামকরণ করা হয়। অপর স্মৃতিস্তম্ভটি হল স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য। ছাত্রদের মধ্যে স্বপন ভট্টাচার্য, সুভাষ দাশ, শিশির বড়ুয়া স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। প্রস্তুতকৃত শহিদমিনার ও স্মৃতিস্তম্ভের নকশা অনুযায়ী ঘোনারপাড়া নবী হোসেন মিস্ত্রিকে দিয়ে প্রধান শিক্ষক আবদুল কাদের এবং কামাল হোসেন চৌধুরীসহ অন্যান্যের দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে স্কুলের পশ্চিম গেইটের পার্শ্বে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি শহিদমিনার ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। শিক্ষক ও ছাত্র সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে এবং স্টেডিয়াম কমিটির কাছ থেকে কিছু পরিত্যক্ত ইট সংগ্রহ করে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শহিদমিনার ও স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য এডভোকেট নূর আহমদ, আওয়ামী লীগ নেতা এ.কে.এম মোজাম্মেল হক, ছাত্রলীগ নেতা নজরুল ইসলাম চৌধুরী, কামাল হোসেন চৌধুরী, দিদারুল আলম, হাবিবুর রহমান কক্সবাজারে প্রথম শহিদমিনার ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ২১ শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনকালে মহকুমা প্রশাসক মোহাম্মদ ওমর ফারুক, জাতীয় পরিষদ সদস্য এডভোকেট নূর আহমদ এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের উপস্থিতিতে শহীদ মিনার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। একই দিনে শহিদ মাস্টার শাহ আলমের বৃদ্ধ পিতা একই স্থানে শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের শুভ উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতাব্যাপ্তির কক্সবাজারে এটিই ভাষা শহিদদের জন্য নির্মিত প্রথম স্থায়ী শহিদ মিনার, এ এলাকায় স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত শহিদদের স্মরণে প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ এবং শহিদদের স্মৃতিস্বরূপ তাদের নামে প্রথম কোনো স্থাপনার নামকরণ।^{৩০}

উদ্বোধনের পর কক্সবাজারের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠন, বিদ্যালয়, কলেজ, পুলিশ বাহিনী, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় শহিদমিনার নির্মাণ না হওয়ায় পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শহিদমিনার কেন্দ্রীয় শহিদমিনার হিসাবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে শহিদ সরণিস্থ শহিদমিনারটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পরিণত হয়েছে। মাঝে বেশ কিছু দিন শহিদমিনারটি কক্সবাজার পৌরসভার অধীনে থাকলেও বর্তমানে কক্সবাজার জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় শহিদমিনার পরিচালিত হচ্ছে। টেকনাফে স্বাধীনতার পরই নির্মিত হয় শহিদমিনার। এ ছাড়া উখিয়া, চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালীতে আলাদা কেন্দ্রীয় শহিদমিনার এবং জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহিদমিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

দোহাই

১. মুস্তফা নুরউল ইসলাম, ‘সাময়িকপট্রে জীবন ও জনমত’, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩, পৃ: ৩১৩।

২. সত্যেন সেন, ‘বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা’, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনালয় এর তৃতীয় প্রকাশ-মার্চ ২০১১, পৃ : ৫৩
৩. প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃ: ৭৮।
৪. অধ্যাপক আবদুর গফুর, বাংলা ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাতায় মুসলমান, শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত ‘বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান’, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৩, পৃ: ৯১-৯২।
৫. ড. আসকার ইবনে শাইখ, বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম, অধ্যাপক কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত ‘প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম স্মারকগ্রন্থ’, সেপ্টেম্বর ১৯৯১, চট্টগ্রাম: প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম গণস্মরণ সভা কমিটি, পৃষ্ঠার নম্বর উল্লেখ নাই।
৬. এম এ বার্বিক, ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস- ঘটনাবহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ’, ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ: ২৭
৭. ড. রংগলাল সেন, ‘বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, ঢাকা: শিক্ষা প্রকাশনী, পৃ: ১৭০-১৮০।
৮. বদরুদ্দীন উমর, ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীত’, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ: পৃ:৩৫/ মোরশেদ শফিউল হাসান, ‘পূর্ব বাংলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া’, ২০০৭, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, পৃ: ৯৭/ ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ‘পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)’, ঢাকা : জ্ঞান বিতরণী, মার্চ ২০০২ পৃ: ২৯১।
৯. বশীর আল হেলাল, ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ: ১৮৯-৯১।/মোস্তফা কামাল, ‘ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন’, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. পৃ: ১৪।
১০. শহীদুল ইসলাম, ‘একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়’, ঢাকা: বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বিশ্বসাহিত্য ভবন, বইমেলা ২০১৩, পৃ: ৬০।
১১. আবদুল গাফফার চৌধুরী, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত ‘বাংলাদেশ’, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ: ২৭।
১২. বদরুদ্দীন উমর, ‘আমাদের ভাষার লড়াই’, টাপুর টুপুর গ্রন্থমালা-১, দ্বিতীয় প্রকাশ-মাঘ ১৩৯৫, চট্টগ্রাম: শিশু সাহিত্য বিতান, পৃ: ৩১-৩২।
১৩. মোহাম্মদ খালেদ সম্পাদিত, ‘হাজার বছরের চট্টগ্রাম’, মার্চ ১৯৯৫, দৈনিক আজাদীর ৩৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা, পৃ: ৪০।/ শরীফ শমশির, ‘চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলন’, আগস্ট ২০০৩, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃ: ২০।
১৪. শহীদুল ইসলাম, ‘একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়’, ঢাকা: বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বিশ্বসাহিত্য ভবন, বইমেলা ২০১৩, পৃ:৬৯।
১৫. বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কল্পবাজার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১, দৈনিক ইনানী।
১৬. সূত্র: সৈনিক, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, উদ্ধৃতি: নুরুল ইসলাম, ‘সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে’ ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯০, পৃ: ১।

১৭. শহীদুল ইসলাম, ‘একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়’, ঢাকা: বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, বইমেলা ২০১৩, পৃ: ৮৮/ বদরুদ্দীন উমর, ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীত’, ৩য় খণ্ড, চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৮৫, পৃ: ২৫২-২৫৩।
১৮. বিস্তারিত দেখুন- আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক ; ‘ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য’, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃ: ৮৮-৯০।
১৯. Rangalal Sen, ‘Political Elites In Bangladesh’, UPL-Dhaka, 1986, pp: 116
২০. শরীফ শমশির, ‘চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলন’, আগস্ট ২০০৩, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃ: ৫২।
২১. বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কল্পবাজার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১, দৈনিক ইনানী।
২২. নুরুল হুদা চৌধুরী, ভাষাসংগ্রামী, বদরমোকাস্থ তার বাসায়।/এম এ বার্বিক, ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস- ঘটনাবহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ’, ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ:২৪৮।
২৩. বদিউল আলম, কল্পবাজারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিকাশ, সাগর তীরে, ১৫ জুলাই ২০০৭, রামু: রম্য প্রকাশন, পৃ: ১৭-১৮।
২৪. সাক্ষাৎকার, ডা. জামাল উদ্দিন আহমদ, ভাষাসংগ্রামী ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, জাসদ নেতা, ১৩ জানুয়ারি ২০১৪, কল্পবাজার শহরের চৌধুরী কুটিরস্থ মুহম্মদ নুরুল ইসলামের বাসায়।
২৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, এম এ শুকুর, পেকুয়া জিএমসি ইনস্টিটিউটের ৮ম শ্রেণির ছাত্র, (১৯৫২), পরবর্তীতে টেকনাফ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও উখিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সংগ্রাম কমিটির সদস্য সচিব (১৯৭১), ২৫ অক্টোবর ২০১৩, টেকনাফ অলিয়াবাদস্থ বাসায়।
২৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, কুতুবদিয়া বড়ঘোপ হাই স্কুলের তৎকালীন ৯ম শ্রেণির ছাত্র, সম্পাদক—দৈনিক কল্পবাজার এবং সহসভাপতি, কল্পবাজার জেলা আওয়ামী লীগ, ২৫ জানুয়ারি ২০১৪, কল্পবাজার শহরের উত্তর রুমালিয়ারছড়াস্থ বাসায়।
২৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রফেসর মোশতাক আহমদ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০, রামু, কল্পবাজার।
২৮. বাদশা মিয়া চৌধুরী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-২৩ ডিসেম্বর ২০১৪, হলদিয়া পালং, উখিয়া কল্পবাজার।
২৯. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, ‘ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস, জুন ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১০৩।
৩০. এম এম সিরাজুল ইসলাম, কল্পবাজারের প্রথম শহিদমিনার ও স্মৃতিসম্ভ, বিজয় স্মারক ২০১৪, কল্পবাজার জেলা প্রশাসন, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ: ১৯৭-৯৮।

এডভোকেট সুরেশ সেন

জন্ম: ১৯০৫ সালে, সরোয়াতলী, বোয়ালখালী (সাবেক পটিয়া থানা), চট্টগ্রাম।
পিতা: ঈশ্বরচন্দ্র সেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রবাদপুরুষ অগ্নিযুগের
বিপ্লবী এডভোকেট সুরেশ সেন ১৯২১ সালে স্কুলে অধ্যয়নকালে বিপ্লবী মাস্টারদা
সূর্যসেনের অগ্নিমস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অনুশীলন দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্বদেশী
আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯২১ সালে গ্রামে গ্রামে তরুণদের সংগঠিত করে
স্বাধীন জন্মভূমির স্বপ্ন দেখার কাজ তারা শুরু করেন। যেটা এখনও যেকোনো
দেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তির মন্ত্র হিসেবে মানুষকে সবসময় অনুপ্রেরণা যোগায়।
১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্কুলে পড়াশুনা করেন। ঠিক ওই সময়
মাস্টারদা সূর্য সেন পড়াশুনা জীবনের ইতি ঘটিয়ে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে
মাস্টারি শুরু করেছেন। ওই বছর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগ আন্দোলনের
কাজে চট্টগ্রাম আসেন। এ উপলক্ষে এক বিরাট জনসভায় চট্টগ্রামের প্রায় স্কুল-
কলেজের ছাত্ররা যোগ দেন। এতে সুরেশ চন্দ্র সেনও ছিলেন। এর পরে প্রতিটি
আন্দোলনে মাস্টারদা সূর্য সেনের সহকর্মী হিসেবে সুরেশ সেন অংশ গ্রহণ করেন।
১৯২৪ সালে চট্টগ্রাম রেলওয়ে ডাকাতি, বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক
ডাকাতি ও বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে
বৃটিশ ‘বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স’ নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য
ছিল ‘রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা’।
এই আইন পাশ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার সশস্ত্র বিপ্লবীদের গ্রেফতার করা শুরু
করে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩৪) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের
মাধ্যমে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করেন। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে
চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহীরা বৃটিশদের হাত থেকে বীর চট্টলাকে ১৮-২২ এপ্রিল পর্যন্ত
মোট ৪ দিন মুক্ত এবং স্বাধীন রাখে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মাস্টারদা সূর্যসেনের
নেতৃত্বে বিপ্লবী অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী (১৮৯২-১৯৬২), বিনোদ বিহারী
চৌধুরী (১৯১১-২০১৩), বিনোদ দত্ত, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী (১৯১২-১৯৩২), সুরেশ
সেন (১৯০৫-১৯৮১), জিতেন দাশগুপ্ত, সুরোজ গুহ, কালী দে, মধুসূদন দত্ত,
কালী চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দত্তিদার, মতি কানুনগো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন,
পুলিন ঘোষ, নিরঞ্জন রায়, কৃষ্ণ চৌধুরী, ক্ষীরোদ ব্যানার্জি, দ্বিজেন দত্তিদারসহ
একদল যুব বিদ্রোহী চট্টগ্রামে বৃটিশ পতাকা (ইউনিয়ন জ্যাক) নামিয়ে সর্বভারতীয়
স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। এ যুব বিদ্রোহকে ইতিহাসবিদরা ভারতীয়
বিপ্লবী কাজের কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে সাহসী কাজ বলে মন্তব্য করেন। মাত্র ২৫
বছর বয়সে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল বৃটিশ বিরোধী চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ এবং
ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সুরেশ সেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার

ভাষাসংগ্রামীদের কথা

দখল করার পূর্ব প্রস্তুতি পর্বের সকল কর্মসূচীর সাথে সুরেশ চন্দ্র সেন যুক্ত ছিলেন। ১৮ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল সংঘটিত ব্রিটিশ বিরোধী সকল যুদ্ধে অংশ নেন তিনি। ২২ এপ্রিল ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। তার সাথে বিনোদ বিহারী, বিনোদ দত্ত ও গুরুতর আহত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করার ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের ধ্রুততার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। বিপ্লবী দলের অনেকেই চট্টগ্রামের অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ (১৯০০-১৯৯২), আনন্দ গুহ, মাখম ঘোষালসহ কয়েক জন বিপ্লবী কলকাতায়, সুরেশচন্দ্র সেন, ময়মনসিংহের ক্ষিতিশ চন্দ্র দেব রায়, নেলীসেন গুপ্তসহ অনেকেই বিপ্লবী মহেশখালী, রামু, কুতুবদিয়া এবং উখিয়ায় আত্মগোপন করেন। সশস্ত্র যুদ্ধকে আরো বৃহত্তর পর্যায়ে সংগঠিত করার দায়ে ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে মহেশখালী আত্মগোপনকালে তিনি ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হন। আটকের পর প্রহসনমূলক বিচারে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ নয় বছর কারাভোগ করেন। আলীপুর জেল, বকসাদুয়ারা ক্যাম্প, বহরমপুর জেলসহ ভারতের বিভিন্ন কারাগারে তার কারাজীবন কাটে। কারান্তরীণ থাকা অবস্থায় রেকর্ড পরিমাণ নাম্বার নিয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণিতে বি.এ এবং ‘ল’ (আইন) পাশ করেন। জেল থেকে বের হয়ে এসে তিনি আইন পেশা এবং রাজনীতির সাথে ভালোভাবেই সম্পৃক্ত হন। মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসির পর অনেক বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি যে পথে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, সেই পথই ঠিক মনে হওয়ায় অন্য অনেকের সাথে তিনিও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে ১৯৪৩ সালের মহামারী বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রাম খাদ্য কমিটির সম্পাদক পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সহায়তায় কক্সবাজার থেকে তিনি কাজ করেছেন। ইতিহাসে মন্বন্তরের সন হিসেবে পরিচিত এ দুর্ভিক্ষের সময় কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশব্যাপী লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষ মানুষকে বাঁচানোর সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করে। এই দুর্ভিক্ষ থেকে মানুষকে বাঁচাতে চট্টগ্রামের পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সাথে পুরো চট্টগ্রাম জেলা জুড়ে বিশেষ করে কক্সবাজারে অমানুষিক পরিশ্রম করে দুর্ভিক্ষ লাঘবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে কক্সবাজার বার-এ আইন পেশায় যোগদেন। ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষার দাবিতে ছাত্রদের মিছিল সমাবেশে যোগদান করাতে সহায়তা করেছেন এবং নিজেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৬০-১৯৭২ পর্যন্ত কক্সবাজার ন্যাপের সভাপতি, ১৯৬৫-১৯৭৬ পর্যন্ত পাক-রুশ মৈত্রী ও বাংলাদেশ-রুশ মৈত্রী সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কক্সবাজার জেলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে জেলে সমবায় সমিতি ও দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন গঠন করেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে দেশকে

রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে কক্সবাজার-টেকনাফ আরাকান সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন ও কক্সবাজার জেলা কৃষক সমিতি গঠন করেন। এছাড়া বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথেও জড়িত ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বিপ্লবী চিন্তাধারা স্মরণীয়। মৃত্যু: ১মে ১৯৮১।

জ্যোতিষ্বর চক্রবর্তী

জন্ম: ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৬, কোয়েপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম। পিতা: রত্নেশ্বর চক্রবর্তী (পেশায় ছিলেন আইনজীবী)। মা: শান্তিবালা দেবী। পৈতৃক কর্মসূত্রে লেখাপড়া শুরু হয় ময়মনসিংহে। ১৯১৮ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটি স্কুলে অধ্যয়নকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তার পিতা রত্নেশ্বর চক্রবর্তীও কক্সবাজার মহকুমায় কংগ্রেসের পক্ষে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে এতদ্বাধ্যলে আসেন। এ সময় পরিবারের আর্থিক দুর্গতি লাঘবের লক্ষ্যে ঠাণ্ডাছড়ি চা বাগানে কেরানির চাকরিতে যোগদান করেন জ্যোতিষ্বর চক্রবর্তী এবং ১৯২৬ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে রাঙ্গুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্টার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। অসহযোগ আন্দোলন শেষে তাঁর পিতা কক্সবাজারে বসতি স্থাপন করেন।

১৯২৮ সনে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৩০ সালে ইংরেজীতে অনার্সসহ বিএ পাশ করে পটিয়া এ.এস.রাহাত আলী হাই স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। পটিয়া এ এস রাহাত আলী হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় মাস্টারদা সূর্যসেনের সাথে পরিচিত হন। এ সময় তিনি বিপ্লবী অনেক ছাত্রদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ এবং পটিয়ার ধলঘাট যুদ্ধের পর মাস্টার সূর্যসেন পটিয়া অবস্থানকালে সূর্যসেনের বিপ্লবের প্রভাবে ডিআইবি পুলিশের নজরবন্দী হন। ১৯৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ধ্রুততার করে ব্রিটিশ ডিআইবি পুলিশ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন ডিটেনশন ক্যাম্পে কারান্তরীণ ছিলেন তিনি। আটক থাকাকালীন সময়ে ডিটেনশনে থেকেই ১৯৩৩ সালে এম.এ, এবং ১৯৩৫ সালে ‘ল’ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে কক্সবাজারে ফিরে ওকালতি শুরু করেন। এরপর বাংলার বিভিন্ন আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন তিনি। প্রায় ৫৫ বছর কক্সবাজার আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। চল্লিশের দশকে কিছুকাল কলকাতার আনন্দবাজার এবং দি স্টেটসম্যান পত্রিকার জেলা সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতা করেন। ১৯৪০-৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কক্সবাজার পাবলিক ইন্সটিটিউটের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০ সালে কক্সবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬২ সালে কক্সবাজার কলেজ, ১৯৬৩ সালে

রাউজান কোয়েপাড়া বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি কক্সবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন এবং সরকারীকরণের পূর্ব দিন পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। কক্সবাজার কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক মোশতাক আহমদ অন্যত্র চলে গেলে তিনি অবৈতনিক অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির একাধিকবার সভাপতি, কক্সবাজার জেলা বাস্তবায়ন পরিষদ সদস্যসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। সমাজসেবায় অবদানের জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসন পদক ২০০৪ (মরণোত্তর) লাভ করেন। মৃত্যু. ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

আবদুল হামিদ খান

জন্ম: ৫ জুন ১৯১৮, হারবাং, চকরিয়া। পিতা: সোলেমান খান। সাতকানিয়া স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে অনার্সে ভর্তি। কিন্তু পারিবারিক জমিদারীর আয় কমতে থাকে এবং দারুণ অর্থ-সংকটের সম্মুখীন হন। ফলে সলিমউল্লাহ মুসলিম হলের মেধাবী ছাত্র-বৃত্তির সাহায্যে কৃতিত্বের সাথে অনার্স পাশ। অতপর পুলিশ বিভাগে চাকরি গ্রহণ এবং মাদারিপুর থানার ওসি নিযুক্ত হন। বছর খানেক পরেই চাকুরিতে ইস্তফা দেন। অতপর শিক্ষা ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ। কক্সবাজার মহকুমার ঈদগাহ উচ্চ বিদ্যালয় ও হারবাং হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবিস্মরণীয়। কক্সবাজার মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ও পাকিস্তান মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের নায়েবে সালারে জিলা' ছিলেন। কক্সবাজারে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাহ্বান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঈদগাঁও হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয়। এ সংগ্রামে ছাত্রদের যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। মৃত্যু. ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।

জ্ঞানেন্দ্র বড়ুয়া

জন্ম: ১৯১৯, মেরংলোয়া, রামু। তিনি ১৯৩৮ সালে খিজারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আইএ ও ১৯৪৩ সালে বিএ পাস করে

৬৫। ভাষা আন্দোলনে কক্সবাজার

শিক্ষকতায় যোগ দেন। তিনি আজীবন রামু খিজারি হাই স্কুলের সরকারি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। জ্ঞান চর্চা ও সংস্কৃতি সাধনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রকৃত শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তিনি এক অতুলনীয় আদর্শ। রামু এলাকায় আধুনিক শিক্ষিত অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছাত্র। প্রচার বিমুখ এই শিক্ষাবিদ বিদ্যার বণিকবৃত্তিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। মেধা ও মননে তাঁর সমতুল্য শিক্ষক সেকালে সমগ্র কক্সবাজার জেলায় বিরল ছিল। তিনি সারণী (১৯৫৭) এবং রামু খিজারি উচ্চ বিদ্যালয় স্মরণিকা (১৯৮৪) সম্পাদনা করেন। মৃত্যু: ২০০০

ফরিদ আহমদ

জন্ম: ১৯২৩, ধলিরছড়া, রামু- কক্সবাজার। পিতা: নাদেরুজ্জামান মাস্টার। মা: জরিনা বেগম। প্রবেশিকা ১৯৩৯ কক্সবাজার হাইবিদ্যালয়, মেধা তালিকায় চট্টগ্রাম জিলায় প্রথম স্থান লাভ। ইন্টারমিডিয়েট ১৯৪১, চট্টগ্রাম কলেজ, মেধাতালিকায় চট্টগ্রাম বিভাগে ও বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান লাভ। বিএ অনার্স ১৯৪৫, এমএ ১৯৪৬, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এলএলবি ১৯৪৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম শ্রেণি। ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের নেতা হিসাব অনন্য। ১৯৪১ সালে চট্টগ্রাম কলেজ-হোস্টেল ছাত্র ইউনিয়নের জিএস, ১৯৪৩ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র-সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক ও হকি ক্যাপটেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ-ডাকসুর ভারপ্রাপ্ত ভিপি ১৯৪৫-১৯৪৬, নির্বাচিত ভিপি ১৯৪৬-১৯৪৭। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দুতে সুবক্তা ছিলেন। আরবি ভাষাও জানতেন। ছাত্রাবস্থায় বাগিতার জন্য সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার প্রাপ্ত। খেলাধুলার ব্যাপারেও অগ্রগামী। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রড জাম্প, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড স্থাপন। ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলায় সমান পারদর্শি। ১৯৫৩-৫৪ সালে কক্সবাজার মহকুমা ক্রীড়া সমিতির সম্পাদক। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব-পাকিস্তান ক্রীড়া ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, এবং ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সহসভাপতি ছিলেন। ষাটের দশকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার বেতার ভাষ্যকার ছিলেন। ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন। সিলেট সংক্রান্ত গণভোটে অবদান উল্লেখযোগ্য। তখন আসামের ছাত্রদের সুসংগঠিত করে সিলেটকে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন (বর্তমানে সংসদ) ডাকসুর নির্বাচিত ভিপি থাকাকালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগ দেন।

ভাষা আন্দোলনে কক্সবাজার। ৬৬

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত তমুদুন মজলিসেরও একজন সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রভাষার বাংলার দাবির প্রথম সমাবেশে তিনিও বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের (বর্তমানে ছাত্র সংসদ) ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফরিদ আহমদ (১৯২৩-১৯৭১; পরবর্তীতে মৌলভী ফরিদ আহমদ নামে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পরিচিত এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে ঘৃণিত হন ও নিহত হন) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম করার লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন। ফরিদ আহমদ তখন একদিনে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র, তেমনি অন্য দিকে ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজ এর ইংরেজি অধ্যাপক ছিলেন।

১৯৪৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর তমুদুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাবির তরুণ অধ্যাপক ড. নুরুল হক ভূইয়া (১৯২৩-১৯৯৮) কে আহ্বায়ক করে রাষ্ট্রভাষা সাব কমিটি নামে যে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। ইতোমধ্যে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকা হতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর প্রতিবাদ করায় এবং ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ তাকে ডেকে সতর্ক করে দিলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় তালিকা হতে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারি ঢাকা সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (বর্তমানে ঢাকা কলেজ) লেকচারার ফরিদ আহমদ পদত্যাগ করেন।

অতঃপর আইন পেশায় প্রথমে কক্সবাজার ও পরে ঢাকায় যোগ দেন। অল্পকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হন প্রসিদ্ধ আইনজীবী হিসাবে। এ সময় থেকে শুরু করেন প্রত্যক্ষ রাজনীতি। কক্সবাজার আইনজীবী সমিতি, কক্সবাজার জামে মসজিদ, দক্ষিণ চট্টগ্রাম মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, কক্সবাজার পাবলিক ইনস্টিটিউট এবং কক্সবাজার ফুড কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫১ সালে কক্সবাজার পৌরসভার সদস্য ও ১৯৫৬ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে নেজামে ইসলাম পার্টিতে যোগদান। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে রামু-উখিয়া-টেকনাফ এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদ-সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৫ সালে দ্বিতীয় গণপরিষদ সদস্য ও পার্লামেন্টারি পার্টির চীফ হুইপ নির্বাচিত। ১৯৫৭ সালে আই. আই. চন্দিগড় মন্ত্রীসভার শ্রমমন্ত্রী মনোনীত হন। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় পরিষদ-সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে পরাজিত হলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ এনে আদালতের শরণাপন্ন হন এবং বিজয় পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। এ সময় জাতীয়

পরিষদে সরকার বিরোধী জোটের (পাক-পিপলস্ গ্রুপ) মুখপাত্র হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। একই সময় সংসদের পাবলিক কাউন্সিল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। ১৯৫৬ সালে ইরানে ও ১৯৫৭ সালে লন্ডনে আন্তর্জাতিক সংসদীয় সম্মেলনে এবং দিল্লীতে আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৭ সালে পার্লামেন্টের অর্থনৈতিক ও গণহিসাব কমিটির সদস্য ও ১৯৬২-৬৩ সালে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান। ১৯৬৪ সালে আল-জিরিয়াতে ১৪ জাতি আফ্রো-এশিয়ান গণ-সংহতি সম্মেলনে কাশ্মীর ডেলিগেশনের ডেপুটি লিডার ও পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫৮ সালে নিখিল পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৪ সালে সম্মিলিত বিরোধী দল বা ‘কপ’এর পূর্ব-পাকিস্তান শাখার চেয়ারম্যান, সে বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সালে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (পিডিএম) সদস্য ও পূর্ব-পাকিস্তান শাখার আহ্বায়ক। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতাসহ অংশ নেন। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) গঠন ও সহ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আওয়ামীলীগের তরুণ প্রার্থী এডভোকেট নুর আহমদের কাছে হেরে যান। একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান ও সুবক্তা হিসেবে জীবনে দু’বা গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালে মহল বিশেষের সাজানো অস্ত্র-মামলায় প্রথম গ্রেপ্তার কক্সবাজারে। দ্বিতীয়বার ১৯৬৪ সালে পশ্চিম-পাকিস্তানে জননিরাপত্তা আইনে। হাইকোর্টের নির্দেশে ২৭ দিন পর মুক্তি লাভ করেন। সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্ব রাখেন। দৈনিক নাজাত (১৯৫৬) পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং মাসিক পৃথিবীর (১৯৬২) উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ মোহাম্মদ আলী ক্রে (১৯৬৫), কারাগারে সাতাইশ দিন (১৯৬৭) এবং দি সান বিহাইন্ড দ্যা ক্লাউডস (১৯৭১)। মোহাম্মদ আলী ক্রে বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর মোহাম্মদ আলীর জীবন ও প্রত্যক্ষ কুস্তিখেলার রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে লেখা একটি পাঠক নন্দিত গ্রন্থ। কারাগারে সাতাইশ দিন ১৯৬৪ সালে ২৭ দিনের জেল জীবনের রোজ-নামচা, এবং দি সান বিহাইন্ড দ্যা ক্লাউডস তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার উপর রচিত একটি দৈনন্দিন ডাইরি বিশেষ। তাঁর শেষ জীবন অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক। মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত শান্তি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করায় স্বাধীনতার পর তিনি ১৯৭১ সালে ১৮ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ তাঁর এক বন্ধুর বাসভবন থেকে অপহৃত হন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ অনুমান ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

সাইমুম শমসের

জন্ম: ১৯২৮, বদরমোকাম, কক্সবাজার। প্রকৃত নাম: আবদুল হাকিম। পিতা: শমসের উদ্দিন। কবি, গল্পকার, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও ক্রীড়াবিদ। ১৯৪৭ সালে ছাত্র ফেডারেশন নেতা শহীদ সাবের এর সঙ্গে কক্সবাজার থেকে ‘জাগরণ’ নামে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে কক্সবাজার শহরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কক্সবাজার পতন এর পর আত্মগোপন করেন। পঞ্চাশের দশকের খ্যাতিমান ফুটবলার ছিলেন। একই সময় মঞ্চনাটক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আজীবন কবিতা গল্প লিখেছেন প্রচুর। কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরির আজীবন সদস্য ছিলেন। মৃত্যু: ৩ মে ২০০২।

মাহফিল আরা আজমত

জন্ম: ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯, হারবাং, চকরিয়া। পিতা: কবির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। জেষ্ঠা: অবিভক্ত বাঙলার জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিষয়ক মন্ত্রী খান বাহাদুর জালাল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। মাহফিল আরা ১৯৪৪ সালে কলকতার কৃষ্ণ নগর ফ্রাইস্টার্ট মিশনারী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৬ সালে লেডি ব্রেনর্ন কলেজ থেকে আই এ, ১৯৫০ সালে ইডেন কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (বি.এড) এবং ১৯৫৬ সালে এম.এড ডিগ্রী নেন।

মাহফিল আরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্রী তখন বাংলার আকাশে প্রবাহিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের হাওয়া। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় মাহফিল আরা অন্যান্য নারী ভাষাসৈনিকের সাথে রাত জেগে পোস্টার লিখতেন এবং স্লোগান তৈরি করতেন। সকালে দুজন দুজন করে সামনের সারিতে ছাত্রীদের নিয়ে মিছিল বের করতেন। পুলিশের টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য ছাত্রীরা শাড়ির আঁচল পানিতে ভিজিয়ে নিতেন। পুলিশের আক্রমণে ছাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেন, তারপর আবারো মিছিল নিয়ে অগ্নিসংযোগ হতেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, খুনি নুরুল আমিনের বিচার চাই, ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ চাই, নুরুল আমিন গদি ছাড় প্রভৃতি স্লোগান ছিলে তাদের মুখে মুখে। রফিক গুলিবদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর সেই রক্তমাখা শার্ট ঝুলিয়ে রেখে আন্দোলনকারীরা মিছিল বের করে। সেই মিছিলে মাহফিল আরাও ছিলেন। সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি আন্দোলনের পুরো সময়টাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটান। ফেব্রুয়ারিতে তার বিয়ের দিন ধার্য করা হয়েছিলো। এ দিকে উত্তপ্ত সেই পরিস্থিতিতে হবু স্বশ্রববাড়িতে

প্রচারিত হয়েছিলো তাদের হবু পুত্রবধু মিছিলে গুলিবদ্ধ হয়েছেন। আন্দোলন শেষে তিনি হল ত্যাগ করে ঘরে ফিরে আসেন।

১৯৫৩ সালে বিয়ে করেন। ১৯৫৩ সালে স্বামী আজমত উল্লাহর কর্মস্থল রাজশাহীল পিএন গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ওই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন। রেডিও কথক হিসেবে খ্যাতি রয়েছে তার। আজীবন প্রতিবাদী মাহফিল আরা আজমত ১৯৬৭ সালের দিকে পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চর্চা ও রেডিওতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তার প্রতিবাদ করেন তিনি। ৬৬, ৬৯, ৭০ এবং ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে দেশমাতৃকাকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার পাশাপাশি ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৭৭-৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৮১ সালে অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যু: ১৭ আগস্ট ১৯৯৩।

শহীদ সাবের

প্রকৃত নাম: এ. কে. এম শহীদুল্লাহ। চকরিয়ার হারবাং নিবাসী সরকারী উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ছালামত উল্লাহর ঔরসে কক্সবাজার সদর উপজেলার ঈদগাঁও (বর্তমান ইসলামাবাদ ইউনিয়ন)’র ফাসিয়াখালী সিকদার পাড়াস্থ মাতুলতালয়ে ১৯৩০ সালের ১৮ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঈদগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নাবস্থায় বাবার কর্মসূত্রে কলকাতায় চলে যান। এই সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘ছন্দশিক্ষা’ নামক পত্রিকা সম্পাদনের সাথে জড়িত ছিলেন। সে সময় সমাজ বিপ্লবীদের সংগঠন মুকুল ফৌজের সাথেও জড়িত ছিলেন। কলকাতা হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নকালীন সময়ে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। জড়িত হন পার্ক সার্কাসের তালক্লার্ক লেনের ‘ছোটদের আসর’ এবং ‘কিশোর সংঘ’ নামে কিশোর সংগঠনের সাথে। কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস রোডে ছোটদের আসর নামে একটি ছোট গ্রন্থাগার ছিল। এ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন শহীদ সাবের। পড়ালেখার পাশাপাশি কর্মকে তিনি বেছে নেন। সাথে সাথে চিন্তার সাথেও পরিচিত হন। ছোটদের আসরের গ্রন্থাগারের অন্য অনেক বইয়ের সাথে ‘ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি’ প্রভৃতি মুক্তচিন্তার বইয়ের পাঠ গ্রহণ করেন। আর এই দিকে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের ধুম্রজাল। এ যুদ্ধের পরিবেশে কিশোর সাবেরের মন-মানস গড়ে উঠতে থাকে এবং এই সময়েই শহীদ সাবের রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে আরেক সহকর্মী সাইমুম শমসের এর সঙ্গে কক্সবাজার থেকে জাগরণ নামে একটি সাহিত্য প্রকাশ করেন। ‘জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত’ স্লোগানে প্রকাশিত ‘জাগরণ’-এ বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দানের বিষয়টি তুলে ধরে সম্পাদকীয় লেখেন শহীদ সাবের।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি মুকুল ফৌজ আন্দোলনে শরিক হন এবং চট্টগ্রামে সু পরিচিতি হয়ে উঠেন। তার লেখা ও বক্তৃতার পারদর্শিতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা তাকে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে মুকুল ফৌজ আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের আই.এ প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র অসম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর নিজ দেশ বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয় তাকে। নিজ জেলা চট্টগ্রামে ফিরে এসে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তথা ১৯৪৭ সালে চট্টগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনে ভাষাসৈনিক মাহবুবুল আলম চৌধুরীসহ অন্য অনেকের সাথে আন্দোলনে শরিক হন। ১৯৪৮ সালের শুরু দিকে শুরু হয়েছে ভাষা সংস্কৃতিতে আঘাত। ১৯৪৮ সালের ২৪-২৭ মার্চের পাকিস্তানের জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’ এই প্রতিবাদে চট্টগ্রাম জে.এম.সেন হলে অনুষ্ঠানের প্রচার করতে গিয়ে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের ভাড়াটে গুন্ডারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন মাহবুব আলম চৌধুরী, সাহিত্যিক গোপাল বিশ্বাসের সাথে শহীদ সাবেরও হামলার শিকার হন। সেদিন হামলাকারীরা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাও পণ্ড করে। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে নিজ জন্ম মহকুমা কক্সবাজারে রাজনৈতিক সফরে আসেন তিনি শহীদ সাবের। তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় কর্মী হয়ে কক্সবাজারের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কক্সবাজারের বিভিন্ন বিদ্যালয় রাজনৈতিক সফর করেন।

অন্যদিকে এই একই সময়ে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘোলাটে। মুসলিম লীগ সরকারের দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব তখন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের ওপর যখন তখন হামলা ও নির্যাতন চালায়। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের পাইকারী হারে গ্রেফতার করে মুসলিম সরকার তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে শুরু হয়েছে পঞ্চাশের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বাস্তবত্যাগের হিড়িক। মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতির শিকার হয়ে অন্য অনেকের সাথে প্রগতিশীল চিন্তার বাহক শহীদ সাবেরকেও ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মূলনীতি বিরোধী সংগ্রামী কমিটি

বাতিলের দাবিতে অসম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন ‘ছাত্র ফেডারেশন’র এক কর্মীসভায় বক্তৃতারত অবস্থায় আলী আকসাজ ও সুভাষ চৌধুরীর সাথে নিরাপত্তা (রাজবন্দী) হিসেবে চট্টগ্রাম জেলে পাঠানো হয়। পরে ঢাকা, রাজশাহী জেলেও পাঠানো হয় তাকে। বিনা বিচারে ৪ বছর আটক থাকার পর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এ কে ফজলুল হক এর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বন্দিচুক্তির আওতায় মুক্তি লাভ করে ঢাকাস্থ কমিউনিস্ট পার্টির কমিউন-এ উঠেন। পরে পার্টির সিদ্ধান্তমতে এক বন্ধুর মাধ্যমে দৈনিক সংবাদে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এসময় সংবাদের সাহিত্য পাতাও দেখতেন। পাশাপাশি কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখেন গল্প কবিতা ও সম্পাদকীয়। এর মধ্যে তিনি জগন্নাথ কলেজ (নৈশবিভাগ) থেকে বিএসএস পাশ করে আর্থিক মন্দা ঘোচাতে তিনি ১৯৫৫ সালে ঢাকা ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে চাকুরীও নিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন করা হয়নি। পিতার আদেশ মোতাবেক সরকারি চাকুরিতে যোগ দিতে ফেডারেল ইনফরমেশন সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট রাজনীতি করায় চাকরিতে নিয়োগপত্র পাননি। এসময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সাথেও দেখা করে চাকুরির নিশ্চয়তা নিয়ে আসেন কিন্তু তার পরদিন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক শাসন জারি করলে তার আর চাকুরি করা হয়নি। ১৯৫৮ এর শেষের দিকে শুরু হয় তাঁর মানসিক বৈকল্য।

চট্টগ্রাম জেলেই বসে বন্দী জীবনের কাহিনী নিয়ে লেখেন তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘আরেক দুনিয়া থেকে’। নিরাপত্তা বন্দী বলে স্বনামে লেখা ছাপানো সম্ভব ছিল না। তাই জামিল হোসেন ছদ্মনামে গোপনে চট্টগ্রাম জেল থেকে পাচার হয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সেই সময়ের নামকরা ‘নতুন সাহিত্য’র চৈত্র ১৩৫৭ সংখ্যায় ছাপানো হয়। লেখাটি নিয়ে কলকাতায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি ও পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়। এরপর থেকেই কথাসাহিত্যিক শহীদ সাবেরের বলিষ্ঠ সাহিত্য যাত্রা শুরু হয়। যোগ দেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তাঁর কর্মজীবন মাত্র ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত ৪ বছর।

২৫ মার্চ ভয়াল কালো রাতের সংবাদ ছাপার কারণে পাক বাহিনীর প্রধান শত্রুতে পরিণত হয় দৈনিক সংবাদ। প্রতিশোধের স্পৃহা হিসাবে পাক হানাদার বাহিনী ৩১ মার্চ রাতে দৈনিক সংবাদ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর সংবাদ অফিসে ঘুমন্ত ছিলেন শহীদ সাবের। দৈনিক সংবাদ অফিসের সাথে তিনিও আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যান।

ছাত্রজীবনেই কবি ও কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাত শহীদ সাবের এর প্রকাশিত গ্রন্থ—রোজনামা আরেক দুনিয়া থেকে (১৩৫৭)। গল্পগ্রন্থ- আবেগ (১৯৫৪), এক টুকরো মেঘ (১৯৫৫), ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান (১৯৫৮)। অনুবাদ: পুশকিনের ইসকাপনের বিবি (১৯৫৮), গোগলের পাগলের ডায়রী (১৯৫৮),

ক্যাথরিন ওয়েন্স পিয়ার-এর কালো মেয়ের স্বপ্ন (১৯৫৮)। অসংখ্য কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বই হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের ইতিহাসে অঙ্গান করতে বাংলা একাডেমি থেকে সেলিনা হোসেনের সম্পাদনায় ‘শহীদ সাবের রচনাবলী’ (জুন ১৯৮১), এবং মুহম্মদ ইদরীস আলী প্রণীত বাংলা একাডেমি জীবনী গ্রন্থমালা ‘শহীদ সাবের’ (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯) এবং ময়হারুল ইসলাম বাবলা এর সম্পাদনায় ‘শহীদ সাবের রচনাসমগ্র’ প্রকাশ করা হয়। যা শহীদ সাবেরকে জানতে যথেষ্ট সহায়তা করবে। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শহীদ এবং প্রতিভাবান কথাশিল্পী সৃজনশীল সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (মরণোত্তর, ১৯৭২ ছোটগল্প), কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার-২০০৩ (মরণোত্তর), কক্সবাজার পদক-২০০৪ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

২০০৮ সালে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজ জেলা কক্সবাজার সদরের ঈদগাঁওতে জাতিসত্তার কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা, জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ, হুমায়ুন ছিদ্দিকি, মনির ইউসুফ, গিয়াস উদ্দিন’র তত্ত্বাবধানে ‘শহীদ সাবের পাঠাগার’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মৃত্যু: ৩১ মার্চ ১৯৭১।

বাদশা মিয়া চৌধুরী

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতীয় প্রেক্ষাপটকে ঘিরে এবং কক্সবাজার অঞ্চলে যত ধরনের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে সবকটি আন্দোলনের এক নিবেদিত প্রাণ তিনি। উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের নলবনিয়া গ্রামের জমিদার আবদুল হাকিম সিকদার ও গুলমেহের বেগমের সন্তান তিনি। ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণকারী বাদশা মিয়া চৌধুরী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পালং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়ন করলেও পারিবারিক ও অসুস্থতার কারণে পটিয়া এ এস রাহাত আলী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে বাংলার আকাশে প্রবাহিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের হাওয়া। এই আন্দোলনে কয়েকজনের সহায়তায় নেতৃত্বও দিয়েছেন ভাষার দাবির মিছিল ও সমাবেশে। ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বড় ভাই আবদুল বারী সিকদার মারা যাওয়ায় পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেননি। মন দেন সমাজসেবায়। ১৯৫৭ সালে বৃহত্তর রত্নাপালং ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৬৩ হলদিয়া পালং ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করা হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন সহচর

হিসেবে ১৯৬৮ সালের দিকে উখিয়া আওয়ামী লীগের সংগঠিত করেন শমসের আলম চৌধুরী, আবদুল হক চৌধুরীসহ অন্যান্যদের সহায়তায়। ১৯৬৪ সালের কপ ও ৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলনে একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠক হিসেবে দেশকে পাকিস্তান থেকে মুক্ত করার কাজে ঝাপিয়ে পড়েন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঝুঁকি নিয়ে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়েছেন। একান্তরে কক্সবাজার মহকুমা সংগ্রাম কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন। মাঝে ৫ মে কক্সবাজারের পরিস্থিতি অনুকূল দেখে আফসার কামাল চৌধুরী, মনিরুল হক চৌধুরী, এমএনএ নূর আহমদ প্রমুখ বার্মায় আশ্রয় নেন। ওখানেই মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার কাজ করেন এবং যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশে আসা গ্রুপকে নিজের অস্ত্র তুলে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার ডাকে অন্যান্যকে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতার পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং পর পর তিনবার হলদিয়া পালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। উখিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তিনি এখনো কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধরে রেখেছেন। মরিচ্যা পালং উচ্চ বিদ্যালয়, নলবনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২টি প্রাইমারি বিদ্যালয়, হলদিয়া পালং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণসহ সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখেন। জনগণের দুর্দশা লাঘবে পাতাবারী নামক এলাকায় একটি বাজারও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

ওবাইদুল হক

জন্ম: ১৪ জানুয়ারি, ১৯৩২, অফিসের চর, ফতেখাঁরকুল, রামু। পিতা: এমদাদ আলী। মা: বিআশা বেগম। ম্যাট্রিক ১৯৫০, রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে মুসলিম ছাত্রলীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং এ সময় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ প্রার্থী পেকুয়ার কবির আহমদ চৌধুরী’র একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে কাজ করেন। রামু খিজারী হাই স্কুলের ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল ও সমাবেশের ওই স্কুলের ১০ম শ্রেণির ছাত্র বদরুজ্জামান, নুরুল ইসলাম হেলালীসহ অন্যান্যদের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রাক্কালে মুসলিম ছাত্রলীগে যোগ দিয়ে মোলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী ও শহিদ সোহরাওয়ার্দীর গণতান্ত্রিক রাজনীতির সক্রিয় কর্মী হিসেবে এলাকায় প্রশংসিত হন। টগবগে যুবক মোহাম্মদ

ওবাইদুল হক ওই সময় ফুটবল খেলায় মাঠ কাঁপানোর সাথে অভিনয় শিল্পে মঞ্চও মাতিয়ে রাখতেন। রাজনীতি, ফুটবল ও অভিনয়ে নিজেকে জড়িত রাখলেও তিনি গৌরবের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ভর্তি হন সাতকানিয়া কলেজে। খেলা আর অভিনয়ে ওই সময় তিনি রামুর পাশাপাশি সাতকানিয়ায় অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সাতকানিয়া কলেজ আই.এ পাশ করে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে দেশে চলে এসে রাজনীতি ও সমাজসেবায় নিয়োজিত হন। এসময় আওয়ামীলীগে যোগ দিলে একান্তরে রামু আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে ১৯৭১-এ রামু থানা এ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ কাউন্সিলের আহ্বায়ক, ১৯৭৩-এ ফতেখাঁরকুল পঞ্চগয়েত প্রধান এবং ১৯৭৩ থেকে কয়েকবার ফতেখাঁরকুল ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮১-১৯৯০ পর্যন্ত রামু উপজেলা ক্রীড়াসংস্থার সাধারণ সম্পাদক, ১৯৮৫-১৯৯০ পর্যন্ত রামু পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রামু ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তার অবদান অনস্বীকার্য। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বংশলতিকা (২০০৪)। মৃত্যু: ২২ জুন ২০১২।

এস, কে, শামসুল হুদা

জন্ম: ১ মার্চ ১৯৩৩, ভেওলা, চকরিয়া। পিতা: মোজাফ্ফর আহমদ। ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। সাতকানিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের জি.এস ছিলেন। '৫২ এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন শেষে আওয়ামীলীগে যোগদান করেন। চকরিয়া আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ১৯৭১ সালে চকরিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে চকরিয়া থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কক্সবাজার কলেজ, চকরিয়া কলেজ ও চকরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। কক্সবাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, রেডক্রস সোসাইটির জীবন সদস্য, কক্সবাজার এডমিনিস্ট্রিটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মৃত্যু: ৫ মে ২০০১।

এ কে এম আহমদ হোসেন

জন্ম: ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, সিকদারপাড়া, হলদিয়া পালং, উখিয়া, কক্সবাজার। পিতা: হাজী আবদুল আলী সিকদার, মা: লালমতি বেগম। বর্তমান নিবাস- উত্তর রুমালিয়ারছড়া, কক্সবাজার। তিনি নলবনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে পালং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে পালং আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দাবিতে মিছিল-সমাবেশে অংশ নিয়েছেন। পরবর্তীতে পালং আদর্শ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছেড়ে পটিয় রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয় থেকেই ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজ আই এ এবং ১৯৬০ সালে একই কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী নেন। এম.এ পাশ করার তিনি কক্সবাজারের প্রথম কলেজ 'কক্সবাজার কলেজ' এর যাত্রা শুরু করলে অবৈতনিক প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম আইন কলেজ থেকে এল.এল.বি পাশ করেন এবং ১৯৭৪ সালে কক্সবাজার মহকুমা হাকিম আদালতে আইনপেশা শুরু করেন। কক্সবাজার আইনজীবী সমিতিতে বিভিন্ন মেয়াদে সদস্য এবং পাঁচ মেয়াদে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে তিনি কক্সবাজার বারের সভাপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্রলীগের সাথে জড়িত হন এবং একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে রসদসামগ্রি সংগ্রহ করে কালুরঘাট যুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার অপরাধে পাক বাহিনী ও তাদের দোসর শাস্তি কমিটির সদস্যরা তার বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়। তিনি পরবর্তীতে আওয়ামী যুব লীগে যোগ দিয়ে জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক, কৃষক লীগের জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক এবং উখিয়া আ'লীগের দু মেয়াদে সভাপতি ছিলেন। পরে কক্সবাজার শহর আওয়ামী লীগ ও জেলা আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক এবং পরবর্তীতে তিন বার সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একেএম মোজাম্মেল হকের মৃত্যুর পর কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একেএম আহমদ হোসেন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৭৫ এর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালের ৩ ডিসেম্বর সরকার তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে কারাগারে পাঠায়। পরে ১৯৭৭ সালের ২৮ মে তিনি মুক্তি পান। তিনি রাজনীতি ও আইনপেশার পাশাপাশি সমাজ সেবা এবং এলাকার উন্নয়নে কাজ করেন। রুমখা ফকিরামুরা মাদ্রাসা ও মরিচ্যা পালং উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং কক্সবাজার সিটি কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এখনও।

শাহনওয়াজ আহমদ জাহাঙ্গীর

জন্ম: ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, ঘুনিয়া গ্রাম, চকরিয়া (মাতুলালয়)। পৈত্রিক নিবাস: কুতুবদিয়া। পিতা: এডভোকেট নজির আহমদ, মা: নুরজাহান বেগম। বর্তমান নিবাস: হাসপাতাল সড়ক, পৌরসভা কক্সবাজার। ম্যাট্রিক ১৯৫২, চকরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। আই.এ ১৯৫৭, বি.এ ১৯৫৯, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। এলএলবি ১৯৬৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকতা: ১৯৬১-১৯৬৮ কক্সবাজার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৬৮ সালে জেলা মুন্সেফ কোর্টে আইন পেশায় যোগদান। পাশাপাশি সাংবাদিকতা, ১৯৬২ সালে পাকিস্তান অবজারভার, ১৯৭৪ সালে দৈনিক আজাদ এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ টাইমস-এর জেলা সংবাদদাতা ছিলেন। ১৯৭৫ সালে কক্সবাজার প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির জেলা সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান আমলে স্বল্পকালীন রাজনীতিতে পিডিপির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭২ সালে জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক সংসদ (বিলুপ্ত)। ১৯৬৯-১৯৮৪ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইনস্টিটিউট এ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরির আজীবন সদস্য। বর্তমানে জেলা জজ আদালতের প্রবীণ আইনজীবী ও কক্সবাজার আইন কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপক। সম্পাদনা: সংযোগ নববর্ষ সংকলন, ১৯৮৫। জেলা সমাজসেবা পদক (১৯৯৬), কক্সবাজার প্রেসক্লাব সংবর্ধনা ও সম্মাননা (১৯৯৭, ২০০১) লাভ করেন।

ছালামতুল্লাহ

জন্ম: ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, বাহারছড়া, কক্সবাজার। পিতা: নজির আহমদ। মা: জয়নাব বেগম। ম্যাট্রিক ১৯৫৫, কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়। আই.এ ১৯৫৭, চট্টগ্রাম কলেজ। বি.এ ১৯৬১, ঢাকা সলিমুল্লাহ কলেজ। এল.এল.বি ১৯৬৪, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৫ থেকে কক্সবাজার আইন পেশা ও পাশাপাশি সাংবাদিকতায় জড়িত আছেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান অবজারভার, ১৯৬৯ সালে এ.পি.পি, ১৯৭৩ সালে দৈনিক জনপদ এবং ১৯৭৪-১৯৮৪ পর্যন্ত বাসস-এর জেলা সংবাদদাতা ছিলেন। ১৯৬৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতি কক্সবাজার মহকুমা শাখা ও কক্সবাজার প্রেস ক্লাব এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি কক্সবাজার শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ছাত্রজীবন থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ১৯৮৫ থেকে তিনবার কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। কক্সবাজার ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংসদ ও বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা জেলা সভাপতি।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার জেলার সভাপতি হিসেবে জেলায় মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনা করেন ও দীর্ঘ তিন দশক আন্দোলনে জড়িত থেকে জেলার বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেন। তিনি সর্বমহলে এক প্রবীণ ও দক্ষ মানবাধিকার কর্মী হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘকাল স্কাউটস কমিশনার ছিলেন। বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জেলা সহ-সভাপতি। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির আজীবন সদস্য। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৮৩ সালে কক্সবাজার জেলার বাস্তবায়ন আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। কক্সবাজার ইসলামিয়া বালিকা ফাজিল মাদ্রাসা, কক্সবাজার আলহেরা একাডেমী এবং কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল বিদ্যালয় এন্ড কলেজসহ অনেকগুলো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘদিন কক্সবাজার আইন কলেজের অধ্যাপক এবং ভাইস-প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কক্সবাজার জেলার সেক্রেটারী, আমীর এবং নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য। তিনি কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমীর জীবন-সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমেরিকা ও আমেরিকার দিনগুলি (দ্রমণ কাহিনী, ২০০৩), কুরআনের আলোকে সাংবাদিকতা (২০১৩)।

ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী

জন্ম: ১৮ অক্টোবর ১৯৩৭, মন্ডলপাড়া, রামু। পিতা: মালেকুজ্জামান সিকদার। ম্যাট্রিক ১৯৫৫, খিজারী উচ্চ বিদ্যালয়, আই.এ ১৯৫৭, চট্টগ্রাম নাইট কলেজ, বি.এ ১৯৫৯, ঢাকা কলেজ। এম.এ ১৯৬০, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৭-১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজ-সাময়িকী মসিরেখা সম্পাদক। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬১-৬২ সালে ইকবাল হল ছাত্র সংসদের এ.জি.এস। ১৯৬২-৬৩ সালে ডাকসুর সাহিত্য-সম্পাদক। ১৯৬২ সালে লাহোরে ছাত্র-নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ-শিবিরে যোগ দেন। এস এম শরীফ শিক্ষা-কমিশন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার দায়ে ছলিয়া জারি হয় তার বিরুদ্ধে। ১৯৬৩ সালে আওয়ামীলীগে যোগদান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে সংগঠক হিসাবে অংশগ্রহণ। হানাদার বাহিনী কর্তৃক তাঁর বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধ ও পুনর্বাসন প্রকল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালন। ১৯৬৮-৬৯ সালে কক্সবাজার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সভাপতি। ১৯৬৯-৭০ সালে চট্টগ্রাম জেলা লবণ উৎপাদক সমিতির সভাপতি। কক্সবাজার মহকুমা

রেফারি ও আম্পায়ার এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি। ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে রামু-উখিয়া টেকনাফ নির্বাচনী এলাকা হতে প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত। বাংলাদেশ বন মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় উপদেষ্টা ছিলেন। রেডক্রস সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে ১৯৭৮ সালে বার্মিজ শরণার্থীদের ত্রাণ-কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯৮৮, ১৯৯১ ও ১৯৯৪ সালের ভয়াবহ বন্যা-জলোচ্ছ্বাস ও গর্কিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ভূমিকা পালন করেন। বেশকয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি, লায়ন্স ক্লাবসহ অনেকগুলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি ও উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। কক্সবাজার মহিলা কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ ছিলেন। এছাড়া কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রামু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার সৈকত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রামু কলেজ প্রতিষ্ঠায় অবদান প্রশংসনীয়। ১৯৯৭-২০০১ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। মৃত্যু: ২০১০

এস এম এম রফিক উল্লাহ

জন্ম: ২ ডিসেম্বর ১৯৩৭, বড় মহেশখালী, মহেশখালী। পিতা: মকবুল আহমদ, মহেশখালী ঋণ সালিশি বোর্ডের চেয়ারম্যান। মাতা: কুলসুম বেগম। প্রবেশিকা ১৯৫৪, কক্সবাজার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। কক্সবাজার হাই স্কুলে ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে খালেদ মোশাররফ (স্বাধীনতায়ুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার, স্বাধীনতা বাংলাদেশের সেনাপ্রধান), আমিরুল কবির চৌধুরী (বিচারপতি), সালামত উল্লাহ (এডভোকেট), নুরুল হুদা চৌধুরী, আখতারুজ্জামান চৌধুরী (তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক গফুরজ্জামান চৌধুরীর ছেলে) এর নেতৃত্বে সংঘঠিত ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন।

তিনি ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এ, ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রে স্নাতক (সম্মান) এবং মিলিটারী সায়েন্স ডিপ্লোমা এবং ১৯৬০ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে মার্কেটিং অফিসার হিসেবে চাকুরিতে যোগদান। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয় হতে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয় হতে যোগাযোগ বিষয়ক ডিপ্লোমা লাভ করেন। সরকারি চাকুরি জীবনে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিমাতা সূলভ আচরণ এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মহেশখালী থানা সংগ্রাম কমিটির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ

করেন। সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯৭২ সালে কুমিল্লা আইন কলেজ থেকে এল.এল.বি ডিগ্রি লাভ। ১৯৭৩ সালে আইনজীবী হিসেবে কক্সবাজার কোর্টে যোগদান। কক্সবাজার জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি, মহেশখালী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কক্সবাজার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান, বড় মহেশখালী বহুমুখী কো-অপারেটিভ সোসাইটির সম্পাদক, চট্টগ্রাম লবণ উৎপাদক সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। কক্সবাজার জেলা ও মহেশখালী উপজেলার সমবায় আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে বহু জনহিতকর কাজ করেন। ১৯৮৩ সালে মহেশখালী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য ১.২২ একর জমি দান করেন। ছাত্রজীবনে বিশিষ্ট সাঁতারু হিসাবে ১০০ মিটার ব্রেস্ট-স্ট্রোক ও ১ মাইল ফ্রি-স্টাইল পুরস্কার লাভ। মৃত্যু: ৬ মে ১৯৮৪, মহেশখালী চ্যানেল নৌ-ডুবিতে। তার লাশ পাওয়া যায় ৭ দিন পর অর্থাৎ ১৩ মে।

মাহমুদুল করিম চৌধুরী

জন্ম: ২৮ জুলাই ১৯৩৮, মগনামা, চকরিয়া। পিতা: আবদুল আজিজ চৌধুরী প্রকাশ ঠান্ডা মিয়া, খ্যাতনামা জমিদার। ম্যাট্রিক ১৯৫৫, পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউট। পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনের ঢেউ লাগে। রাজধানী ঢাকার ছাত্র হত্যার খবর পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটে পৌঁছার পরে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে ও বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। পর পর দুইদিন ছাত্র ধর্মঘট পালন করে ও বিক্ষোভ সমাবেশ-মিছিল করে। মাহমুদুল করিম চৌধুরী (পরে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন) জমিদার আবদুল আজিজ চৌধুরী প্রকাশ ঠান্ডা মিয়ার সন্তান হিসেবে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা ছিলো। পাশাপাশি জমিদারের ছেলে হিসেবে মাহমুদুল করিম চৌধুরী পূর্ব থেকেই বাম রাজনীতির সাথে পরিচিত ছিলেন বিধায় এসব মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১৯৫৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি ১৯৫৫-৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক। ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি এর সঙ্গে জড়িত হন। কক্সবাজার জেলা ন্যাপের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, পরে সভাপতি হিসেবে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন। ওই সময় তার বড়ভাই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কক্সবাজার মহকুমার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। '৬৯ এর গণ আন্দোলনে এবং '৭১ এর

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন। ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জাগদলে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনোনীত। ১৯৭৯ সালে চকরিয়া-কুতুবদিয়া নির্বাচনী এলাকা থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮১ সালের সামরিক শাসন জারির পর কারারুদ্ধ ও পরে মুক্তি লাভ। ১৯৬৫ সালে পূর্ব-পাকিস্তান লবণ উৎপাদন সমিতি গঠন করেন। রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। মৃত্যু: ২০০৬।

নূর আহমদ

জন্ম: ১৯৩৮, টেকনাফে। প্রবেশিকা ১৯৫৪, পেকুয়া জিএমসি ইনস্টিটিউট। আই.এ ১৯৫৬, চট্টগ্রাম কলেজ। বি.এ অনার্স ১৯৬০, এম.এ ১৯৬১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরে ‘ল’ ডিগ্রি নিয়ে ১৯৬৬ সালে কক্সবাজার বারে যোগদান এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুনাম অর্জন করেন। কক্সবাজার বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামীলীগে যোগদান করেন। ১৯৭৩ পর্যন্ত জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে চকরিয়া কক্সবাজার থেকে আওয়ামীলীগে প্রার্থী হিসাবে জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) নির্বাচিত। ১৯৭১ সালে কক্সবাজার মহকুমা সংগ্রাম কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে জাসদে যোগদান এবং জাসদের রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় কিছুদিন রাজবন্দী ছিলেন। কক্সবাজার-টেকনাফ এর শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

জন্ম ৬ জুন ১৯৩৮। তৎকালীন চকরিয়া উপজেলা ও বর্তমানে পেকুয়া উপজেলার মগনামার হাজি আশারায় মিয়া ও খুইল্যা বিবির সন্তান তিনি। ১৯৫৩ সালে কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (স্থানীয়ভাবে এ বিদ্যালয়টি বড়ঘোপ হাই স্কুল নামে পরিচিত) থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে বাংলার আকাশে প্রবাহিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের হাওয়া। এই আন্দোলনে কয়েকজনের সহায়তায় নেতৃত্বও দিয়েছেন ভাষার দাবির মিছিল ও সমাবেশে। ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন সাতকানিয়া কলেজে (ওই সময় কক্সবাজার জেলায় কোনো কলেজ ছিলো না)। ওই কলেজে পড়াকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট

আন্দোলন। পাকিস্তান বিরোধী প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র হিসাবে নূরুল আমিনের জনসভা বানচাল-প্রচেষ্টার অভিযোগে চট্টগ্রামের লালদীঘির প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে অন্যান্যদের সাথে আটক হন ও ৪ ঘণ্টা পরে মুক্তি পান তিনি। ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রাম নৈশ কলেজ (বর্তমানে সিটি কলেজ) থেকে স্নাতক পাশ করে পাকিস্তান সরকার বিরোধী এনডিএফ-এ যোগ দেন এবং ১৯৬৩ সালে এনডিএফ-এর কক্সবাজার জেলা আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন সহচর হিসেবে ১৯৬৪ সালে কক্সবাজার মহকুমা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালের কপ আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ‘৬৯-এর অভ্যুত্থান ও ‘৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে দেশকে পাকিস্তান থেকে মুক্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঝুঁকি নিয়ে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেঁচেছিলেন। মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ‘ছয় দফা কী ও কেন?’ এবং ‘ইসলামের দৃষ্টিতে ছয় দফা’ নামে দুটি পুস্তিকা লিখে ছয় দফা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেন। অনেকটা সফলও হন তিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ কৃষকলীগ-এর জেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য। ১৯৭৪ সালে বাকশালে যোগদান ও কেন্দ্রীয় পলিটবুরোর সদস্য মনোনীত। পরবর্তীতে বাকশাল বিলুপ্ত হলে আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করেন এবং তিনি এখনো কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধরে রেখেছেন। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ১৯৬১ সালে দৈনিক আজাদীর চট্টগ্রাম অফিসে স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে সাংবাদিকতার সূচনা। ১৯৭২ সালে বাংলার বাণী’র কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি। ১৯৭৩-৭৪ সালে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এনা’র জেলা প্রতিনিধি। ১৯৭৮ সালে সাপ্তাহিক কক্সবাজার, ১৯৮০ সালে সাপ্তাহিক স্বদেশ বাণী এবং ১৯৯১ থেকে কক্সবাজার জেলার প্রথম নিয়মিত দৈনিক কক্সবাজার সম্পাদনা ও প্রকাশ। বর্তমানে পত্রিকাটি রঙিনরূপে প্রকাশ হচ্ছে। তিনি ১৯৭৪ সালে মাসিক সাময়িকী প্রিয়তমা প্রকাশ করেন। কক্সবাজার সাংবাদিকতার বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৫ সালে কক্সবাজার প্রেসক্লাব গঠন ও ক্লাবের আহ্বায়ক মনোনীত হন। ১৯৭৬ থেকে পরপর আট দফা প্রেসক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন।

জামাল উদ্দিন আহমদ

জন্ম: ১৯৩৯, কাকারা, চকরিয়া। পিতা: আবদুছ ছোবহান। মাতা: জরিলা খাতুন। পেশায় চিকিৎসক। কক্সবাজার অঞ্চলের রাজনৈতিক ও বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের এবং সমাজসেবা জগতের অন্যতম পুরোধা হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে ৮১ বছর বয়স্ক জামাল উদ্দিন আহমদ চকরিয়ার কাকারার আবদুছ ছোবহান ও

জরিনা খাতুনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে চকরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। স্কুলে পড়াকালীন সময়ে সংগঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন সংগ্রাম। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ৮ম শ্রেণিতে পড়তেন। এই আন্দোলনে কয়েকজনের সহায়তায় নেতৃত্বও দিয়েছেন ভাষার দাবির মিছিল ও সমাবেশে। ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলেও স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন ১৯৫৭ সালে। এরপরই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৬৫ সালে এম.বি.বি.এস পাশ করেন। তারপর কেরানীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করে চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। পরে হুজুয়াত্রীর সফিনা জাহাজের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, স্যার আশুতোষ কলেজ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পড়াকালীন সময়ে বাংলার আকাশে সংঘটিত সবকটি আন্দোলনে তিনি শরিক হন। পাকিস্তান বিরোধী প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন তিনি। ১৯৬২ সালের এস এম শরীফ কমিশন বিরোধী, ১৯৬৪ সালের কপ আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর অভ্যুত্থান ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে দেশকে পাকিস্তান থেকে মুক্ত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিয়োজিত হন। ১৯৭২ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)'র কক্সবাজার জেলা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩ সালে সংসদ নির্বাচনে জাসদের প্রার্থী হিসাবে কক্সবাজার-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জাসদ বিভক্ত হয়ে বাসদ গঠিত হলে বাসদ (মাহবুব) এর জেলা সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন। সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় নিবেদিত। কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমির জীবন সদস্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০২ চকরিয়া সমিতি পদক লাভ করেন। ক্রীড়াবিদ, শিক্ষানুরাগী ও সংগঠক হিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পেয়েছিলেন। চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি, পরে সভাপতি। বর্তমানে তিনি বাসদ রাজনীতি ও চকরিয়া রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

নজির আহমদ

জন্ম: ৭ জানুয়ারি ১৯৩৯, দিগরপানখালি, চকরিয়া। পিতা: মৌলবি আলী মিয়া। ম্যাট্রিক ১৯৫৫। আই.এ ১৯৫৭, বি.এ ১৯৬১, চট্টগ্রাম কলেজ। সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ১৯৭৪, হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ১৯৬১ সালে ডেইলি ইস্টার্ন এক্সামিনার-এর সহ-সম্পাদক হিসাবে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। ডেইলি ইউনিটিতে চিফ রিপোর্টারসহ বিভিন্ন পদে ১৯৬৩-১৯৬৯ পর্যন্ত।

১৯৭২ সালে সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন ডেইলি পিপলস ভিউ পত্রিকায়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সিনিয়র রিপোর্টার পদে যোগদান ও বাসস চট্টগ্রাম ব্যুরো চিফ হিসেবে ২০০০ সারে অবসর গ্রহণ। সাংবাদিকদের রুটিরুজির আন্দোলনের একজন অগ্রনায়ক। ১৯৬৫ থেকে তিন দফা চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি ১৯৭১-১৯৭৫। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত সদস্য ১৯৬৪-১৯৭৮। চট্টগ্রাম সাংবাদিক কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির চেয়ারম্যান ১৯৭৮-১৯৮৪। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ১৯৯৩-৯৪। পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে রাশিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, ভারত, সৌদি-আরব, সিঙ্গাপুর ও পাকিস্তান ভ্রমণ। প্রকাশিত উপন্যাস: সওদাগর কন্যা (১৯৮৮), অনুপম ভালবাসা, Love and Freedom, ঝড়ের পর ঝড়। গল্পগ্রন্থ: রক্তাক্ত লাশ (১৯৮৮)। প্রবন্ধ-সংকলন: সৃষ্টিকর্তা ও মানব ধর্ম, Secred Verses, Fall of Iron Curtain. সম্পাদনা: স্মরণিকা-১৯৮১, স্মরণী-১৯৮১ (বৃহৎচট্টগ্রাম-মনীষী জীবনী সংকলন)। শিশুতোষ: যত সব মজার গল্প। মৃত্যু: ২০০৯

এম এ শুকুর

জন্ম: ১ আগস্ট ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ, অলিয়াবাদ, টেকনাফ পৌর এলাকা। পিতা: মোহাম্মদ ইসমাইল সওদাগর, মাতা: গোল চেমন। ১৯৫৫ সালে পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে বয়ে যায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনের হাওয়া। তিনি বাল্যকালেই পৈত্রিক গ্রাম টেকনাফ পৌর এলাকার অলিয়াবাদ ছেড়ে চকরিয়া উপজেলার বিএমচর মাতুতালয়ে থেকে বিএমচর প্রাইমারী স্কুলে পড়ালেখা শুরু করেন। সে সময় প্রাইমারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়নো হতো। বিএমচর প্রাইমারী স্কুলের পাঠ চুকিয়ে পেকুয়া গিয়ে পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে তিনি পেকুয়া জিএমসি ইন্সটিটিউটের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তিনি ছিলেন স্কুলের সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস)। জিএস ছিলেন বারবাকিয়া ইউনিয়নের ফাসিয়াখালী এলাকার মোহাম্মদ ওমর। একই সাথে তিনি নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফলে তিনি সহ কয়েকজন মিলে ছাত্র বিক্ষোভে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ থেকে বি.কম ডিগ্রি নিয়ে ব্যাংকে যোগদান করেন। একই বছরে ব্যাংকের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে টেকনাফ জুনিয়র হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান।

তিনি এলাকার শিক্ষানুরাগী লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করে টেকনাফ জুনিয়র বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করে বিদ্যালয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি ১৯৬৬-৬৭ সালে বি.এড ডিগ্রি নেন। পরে তিনিও টেকনাফ হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দক্ষতার সাথে সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ জীবনে তিনি টেকনাফ জুনিয়র স্কুল, টেকনাফ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, উখিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এম.ই.এস উচ্চ বিদ্যালয় ও টেকনাফ নয়াপাড়া আলহাজ্ব নবী হোসাইন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অবসর গ্রহণ করার পরে ১৯৯৯ হতে ২০০৩ পর্যন্ত কক্সবাজার এয়ারপোর্ট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে টেকনাফ থানা সংগ্রাম কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন।

আনোয়ার হোসেন

জন্ম: ১৯৩৯, কাকারা, চকরিয়া। পিতা: মীর হোসেন। মাতা: সৈয়দা খাতুন। কর্মজীবনের শুরুতে কর্ণফুলী কাগজ কলে চাকুরী গ্রহণ। পরে ব্যবসায় মনোনিবেশ। ঠিকাদার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতি ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত। ষাটের দশকে আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে যোগদান ও একান্তরে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি চকরিয়া সমিতি-চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদকসহ চট্টগ্রাম আবাহনী ক্রীড়াচক্র, চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটি, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, লায়নস ক্লাব, শাপলাকুঁড়ির আসরসহ বহু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। তাঁর সম্পাদিত প্রকাশনা: স্মরণীয়-বরণীয়: চকরিয়া-পেকুয়া (২০০৩)। এছাড়া চট্টগ্রামস্থ চকরিয়া সমিতির কয়েকটি স্মরণিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।

মোশতাক আহমদ

জন্ম: ৮ জানুয়ারি ১৯৪০, মন্ডলপাড়া, রামু। পিতা: রশিদ আহমদ সমবায় কর্মকর্তা ও শিক্ষক ছিলেন। মা: মুনিরা বেগম। ম্যাট্রিক ১৯৫৫, রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয়। ইন্টারমিডিয়েট ১৯৫৭, চট্টগ্রাম কলেজ। বি.এ অনার্স ১৯৬১, এম.এ ১৯৬৩, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাতকানিয়া কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবনের সূচনা। ১৯৬৩ সালে কক্সবাজার কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন ও প্রতিষ্ঠাতা প্রভাষক হিসাবে যোগদান। ১৯৬৫ সালে

পিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারে নির্বাচিত ও ঢাকা সরকারি কলেজে প্রভাষক নিযুক্ত। পরবর্তীতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, সিলেট এমসি কলেজ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৭ সালে কমিশন অফিসার (শিক্ষা) হিসাবে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগদেন। মতদ্বৈততার কারণে সে চাকরি ত্যাগ করে ১৯৬৯ সালে সিলেট সরকারি কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে সরকারি চাকুরি ত্যাগ করেন। ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রামের হলাইন সালেহ-নুর কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৮৯ সালে থেকে ২০০৫ সালে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত রামু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭০ সালে রামু বাংলা কলেজ (অধুনালুপ্ত) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। রামু খিজারী উচ্চ বিদ্যালয় ও রামু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষানুরাগী সদস্য। একযুগেরও অধিক সময় যাবৎ ঐতিহ্যবাহী খিজারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রামু থানা মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্ব দেন। কক্সবাজারের পতন হলে বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকেও শত্রুসেনাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। স্বাধীনতার পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ-মোজাফ্ফর) যোগদান এবং কক্সবাজার জেলা সহ-সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ন্যাপের প্রার্থী হিসাবে রামু-উখিয়া-টেকনাফ এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৭৫ সালে পার্টির পক্ষ থেকে মস্কো ভ্রমণ এবং সেখানে কার্লমার্কস-লেনিনের রাজনৈতিক দর্শনের উপর ছয় মাস গবেষণা করেন। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে মস্কো থেকে স্বদেশে ফিরে করেন। সে বছর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, হত্যা, কু্য ও পাল্টা কু্য এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সক্রিয় হন। নন ভায়োল্যান্স ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ শাখার চেয়ারম্যান, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমির উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন শিক্ষা, সাহিত্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি হিসাবে সক্রিয়। গীতিকবি, প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসকার হিসাবে খ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ: Glimpses of Cox's Bazar (১৯৯৫)। Gleanings from Jibananda Das (জীবনানন্দের নির্বাচিত কবিতার ইংরেজী অনুবাদ, ২০০২), I Bleed (১৯৯৮, আবুল ফারুক খানের আত্মস্মরণ কাব্যের অনুবাদ)। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কক্সবাজার জেলার শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ ১৯৯৮, চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ২০০৩, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে কৃতি শিক্ষাবিদ পুরস্কার ২০০৩ অর্জন। সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার ২০০৩ অর্জন করেন।

আমিরুল কবির চৌধুরী

জন্ম: ২৩ জুন ১৯৪০, নোনাছরি, রামু। কক্সবাজার জেলার প্রথম বিচারপতি। পিতা: গোলাম কবির চৌধুরী। তিনি মোখতার ছিলেন। মাতা: গুলনুল বেগম চৌধুরী। ম্যাট্রিক ১৯৫৫, কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়। আই.এ ১৯৫৭, বি.এ ১৯৫৯, চট্টগ্রাম কলেজ। এল.এল.বি ১৯৬২, চট্টগ্রাম আইন কলেজ। অতঃপর চট্টগ্রাম জজ কোর্টে আইন পেশায় যোগদান। ১৯৭২ সালে সুপ্রীম-কোর্ট, হাইকোর্ট এবং ১৯৯২ সালে আপীল বিভাগের আইনজীবী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রাম জজ কোর্টের এপিপি এবং ১৯৭৯-৮৩ পর্যন্ত পিপি ছিলেন। ১৯৮৪-১৯৮৮ পর্যন্ত হাইকোর্টে সরকারি কৌশলী। ১৯৮৭-৮৮ তে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় বার এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮৯-৯৬ পর্যন্ত ডেপুটি এটর্নি জেনারেল নিযুক্ত। ১৯৯৬ সালে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত। ২০০১ সালে সুপ্রীম-কোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম-কোর্ট আপিল-বিভাগের বিচারপতি নিযুক্ত। আইন পেশার পাশাপাশি সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখেন। ১৯৫৩-৫৫ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, পল্লীমঙ্গল সমিতি, রামু এবং লিয়াকত স্মৃতি ক্লাব, কক্সবাজার। ১৯৬৪-৯০ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত সভাপতি, কক্সবাজার সমিতি, চট্টগ্রাম। ১৯৮৪-৯০ পর্যন্ত সহ-সভাপতি, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম। ১৯৮০-৯০ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজ কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বর্তমানে এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থা দেশের বিশিষ্ট সমাজসেবীদের মূল্যায়ন ও স্বর্ণ পদক দিয়ে থাকে। তিনি অপরাধ সংশোধনী ও পুনর্বাসন সংস্থা চট্টগ্রামের সভাপতি। আজীবন সদস্য: রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, ডায়াবেটিক সমিতি, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি, চট্টগ্রাম কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলাম আত্মবাদ, রোগী কল্যাণ সমিতি, চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকা। আযাদ মুসলিম ক্লাব, রামু সমিতি, ঢাকা। সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে বহু দেশ সফর করেন এবং আন্তর্জাতিক সমাজ-কল্যাণ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৮৮ সালে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী পুরস্কার, ১৯৯২ সালে সেবা নিকেতন পুরস্কার চট্টগ্রাম, ১৯৯৫ সালে বায়তুশ শরফ গুণীজন সংবর্ধনা, ২০০০ সালে কক্সবাজার প্রেসক্লাব পদক লাভ করেন। আইন ও সমাজ-সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২০০৭ সালে বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণের পর সরকার কর্তৃক শ্রম আপীল ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত, ২০০৮ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার পর কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হন।

আইন পেশার পাশাপাশি সমাজ সেবায় অংশগ্রহণ। জাতীয় আইনজীবী সমিতি প্রতিষ্ঠাকল্পে সাংগঠনিক কমিটির সদস্য। ১৯৮৭-৮৮ সালে সুপ্রীম কোর্ট (হাইকোর্ট ডিভিশন) চট্টগ্রাম বেঞ্চ আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৩-৫৪ সালে কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির সম্পাদক। ১৯৫৩-৫৪ সালে রামু উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৩-৫৮ সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগ ও ১৯৫৫-৫৮ যুগ্ম-সম্পাদক, জেলা মুসলিম ছাত্রলীগ। ১৯৬৪-৯০ প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সমিতি, চট্টগ্রাম। ১৯৯১-৯৬ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, ১৯৭৩-৯০ বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সমাজকল্যাণ কাউন্সিলের সদস্য ও ১৯৮৪-৯০ সরকার কর্তৃক গঠিত কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা সমাজকল্যাণ কাউন্সিলের সহ-সভাপতি। ১৯৮০-৯৬ সমাজকল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বিচারপতি হিসাবে নিয়োগের আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সংস্থা, চট্টগ্রাম সমাজকল্যাণ ট্রাণ কমিটি, খরুলিয়া পল্লী ধর্ম ভাণ্ডারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তিনি ১ ও ৩ নম্বর চট্টগ্রাম শহর সমাজসেবা প্রকল্প ও ফুলকুড়ি আসর, চট্টগ্রাম-এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, নাটার, ডায়াবেটিক সোসাইটিসহ বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বাঁশখালী সমাজসেবা সংসদ, কুতুবদিয়া সমিতি, চট্টগ্রাম, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া সমিতি, ঢাকার সম্মানিত সদস্যপদ ও ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বায়তুশ শরফ কর্তৃক ফেলোশীপ প্রদান। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সরকার-এর সমাজকল্যাণ কাউন্সিল কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী পদক, ১৯৯২ সালে চট্টগ্রামের সেবানিকেতন পদক, ২০০০ সালে কক্সবাজার প্রেসক্লাব পদক প্রদান এবং ১৯৯৫ সালে আঞ্জুমানে ইন্তেহাদ কর্তৃক গুণীজন সংবর্ধনা। ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশের রোটারী ক্লাব সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্মাননা প্রদান।

১৯৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে আন্তর্জাতিক সমাজ কল্যাণ সম্মেলন, ২০০১ সালে দিল্লীতে দক্ষিণ এশিয়ার বিচারপতিদের ওয়ার্কশপ, ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ‘গ্লোবাল জাজেস ফোরাম’-এ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের উচ্চ আদালতসমূহের কার্যাবলী অবলোকন। ২০০৫ সালে ইতালিতে অনুষ্ঠিত আইডিপি সংক্রান্ত কোর্সে অংশগ্রহণ, ২০০৬ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিচারপতি সম্মেলনে ও ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে অনুষ্ঠিত ১৫তম আন্তর্জাতিক বিচারপতি সম্মেলনে

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান। ভারত, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মালদ্বীপ-এ অনুষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলন ও ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান। যুক্তরাজ্যের হাউজ অফ কমন্স ও হাউজ অফ লর্ডস-এর অধিবেশন প্রত্যক্ষ করেন। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উক্ত দেশের মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশনা উৎসবে যোগদান ও যুক্তরাজ্যে এসেব্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবাধিকার সম্পর্কিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ প্রদান। ভারত, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, আরব আমীরাত, ইতালি, কাতার, মালদ্বীপ, মালয়শিয়া ও পাকিস্তান ভ্রমণ করেন। আইন ও সমাজসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ জাতীয় দৈনিক ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রামে থাকাকালীন বাংলাদেশ বেতারে সমাজকল্যাণ ও আইন বিষয়ে কথিকা উপস্থাপন করতেন।

নূরুল হুদা চৌধুরী

জন্ম: ২৫ অক্টোবর ১৯৪০ বদরমোকাম, কক্সবাজার। পিতা: আবদুল অদুদ চৌধুরী, মাতা: সহর বানু। ১৯৫৫ সালে কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৫২ সালে কক্সবাজার স্কুলের ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবির মিছিলে কক্সবাজারে অন্যান্যদের সহায়তায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনিসহ অনেক অগ্রসর ছাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটসহ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

পরে তিনি বি.এ পাশ করে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। কক্সবাজারের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াঙ্গনে তার পদচারণা লক্ষ্য করার মতো। ১৯৬০ সালে সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঙ্গীতায়তন প্রতিষ্ঠা হলে তিনি প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন। এরপর থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সাথে উৎসাহিতভাবে জড়িত রয়েছেন। ১৯৭৫ সালে তিনি কক্সবাজার মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। পরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন (১৯৯২-২০০০), কেন্দ্রীয় ঈদগাঁহ কমিটির কোষাধ্যক্ষ, ডায়াবেটিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি (২০০০-২০০৫, ২০০৮-২০০১৪) চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি, কক্সবাজার পৌর প্রিয়ার্যাটরি উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি, কক্সবাজার রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহ-সভাপতি (১৯৮৯-৯১), জেলা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (১৯৯১-২০১১), সমাজ সেবা প্রকল্প

পরিষদের সভাপতি, বাংলাদেশ এ্যামেচার এমেনেস্টিক ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সদস্য, কক্সবাজার শিল্পকলা একাডেমির সদস্য, কক্সবাজার ইন্সটিটিউট এন্ড পাবলিক লাইব্রেরির সহকারী সম্পাদক, রেফারী সমিতির সভাপতি, জেলা রোগী কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে কক্সবাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও বদরমোকাম জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মনুথ বড়ুয়া

জন্ম. ১৬ মে ১৯৪০, ফতেখাঁরকুল, রামু। পিতা: অরুণানন্দ বড়ুয়া। মাতা: কাঞ্চন প্রভা বড়ুয়া। ম্যাট্রিক ১৯৫৫, খিজারি হাইবিদ্যালয়, রামু আইএ ১৯৫৭, মহারাজ মনীন্দ্র কলেজ, কলকাতা। বিএ অনার্স ১৯৬১, এমএ ১৯৬২, ইংরেজি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬২-৬৫ পর্যন্ত কলকাতার কয়েকটি বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৫ সালে ইংল্যান্ড গমন করেন এবং ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের নিরাপত্তা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে ব্রিটিশ সরকারের চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতপর ১৯৭২-১৯৯৯ পর্যন্ত লন্ডনে একটি বেসরকারি ব্যাংকে শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৯৯ সালে উক্ত দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ। ইংল্যান্ডে বর্ণবাদ বিরোধী মানবাধিকার আন্দোলনে একজন বাঙালি সংগঠক ছিলেন। কর্মজীবনে ও অবসরকালে ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কায়িক ও আর্থিক শ্রম বিনিয়োগ করেন। এই কাজের জন্য মায়ের নামে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘কাঞ্চন প্রভা স্মৃতি কল্যাণ ট্রাস্ট’। নিজের অর্জিত সম্পদের এক বিরাট অংশ এই ট্রাস্টে দান করেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে নানাবিধ চিন্তা ও সাধনার উপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: The Life of Buddha. Buddhish Dharma, The Buddha over Britain, The Story of Trice Hills, তিন গিরির উপাখ্যান, রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে।

বদিউল আলম

জন্ম. ৩ জানুয়ারি ১৯৪১, ধলিরছড়া, রামু। পিতা: ছিদ্দিক আহমদ। মাতা: মোস্তফা বেগম। ম্যাট্রিক ১৯৫৭, মহেশখালী উচ্চ বিদ্যালয়। ইন্টারমিডিয়েট ১৯৫৯, সাতকানিয়া কলেজ। বি.এ ১৯৬৮, নাজিরহাট কলেজ। ১৯৬৮ সালে দৈনিক পয়গামের কক্সবাজার সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। ১৯৬৯ সালে দৈনিক পাকিস্তান, ১৯৭০ সালে দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৭২ সালে দৈনিক বাংলা,

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৬৮ সালে কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-কোষাধ্যক্ষ, পরবর্তীতে নির্বাচিত একাধিকবার সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি'র (২০০০-২০০৬) দায়িত্ব পালন করেন। কক্সবাজার জেলা বাস্তবায়ন পরিষদ-১৯৮৩'র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সভাপতি: কক্সবাজার শহর সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, মৌলভী ফরিদ আহমদ স্মৃতি পরিষদ, নাদেয়ুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি, ঈদগাঁও বাজার জামে মসজিদ কমিটি। এছাড়া বহু সংগঠনের নেতৃত্বে দান করেন। কক্সবাজার মহিলা কলেজ (বর্তমানে সরকারি), সিটি কলেজ, সৈকত বালিকা বিদ্যালয়, ফরিদা-রশীদ প্রাইমারি স্কুল, হেফজখানা ও এতিমখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখেন। বেশ কয়েকটি সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। যথাক্রমে: কক্সবাজার জেলা বর্ষপূর্তি স্মৃতি স্মারক'৮৫, নয়ান (১৯৮৭), সমুদ্র সংলাপ (প্রধান সম্পাদক, ১৯৮৫), সূচনা (১৯৮৮, ১৯৮৯), রেডক্রস (১৯৮৫), উর্মিমালা (১৯৮৮), প্রয়াস (১৯৮৯) ও কক্সবাজারের ইতিহাস (সম্পাদনা পরিষদ সদস্য ও অন্যতম লেখক, ১৯৮৯)।

নিখিলেশ্বর চক্রবর্তী

জন্ম: ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, কক্সবাজার শহর। পিতা: এডভোকেট জ্যোতিষ্বর চক্রবর্তী। শিক্ষা: ম্যাট্রিক ১৯৫৬ (প্রথম বিভাগ), কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৫২সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণিতে ছাত্র ছিলেন এবং ভাষার দাবির মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেন। ইন্টারমিডিয়েট ১৯৫৮, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, মেধা তালিকায় ১০ম স্থান। বিএ অনার্স ১৯৬১, এমএ ১৯৬২ ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এমএ সাংবাদিকতা, প্রথম ব্যাচ ১৯৬৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৪ পর্যন্ত Pakistan Observer-এ সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি ঢাকা সিটি কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকা নবকুমার ইনস্টিটিউটে এবং কায়েদে আজম কলেজেও কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৪-তে লন্ডন গমন এবং London Education Authority-র Stewart Headlam School- এর অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। ২০০৬ সালে সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তান আমলে লন্ডনে ইস্ট পাকিস্তান সোসাইটির একজন সংগঠক। বং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত।

মথুরা বিকাশ পাল

জন্ম: ৩১ জানুয়ারি ১৯৪২, পালংপাড়া, ঈদগাঁও। পিতা: জগদ্বন্ধু পাল। মাতা: নতুন কুমারী পাল। ম্যাট্রিক ১৯৫৭, ঈদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়। ঈদগাঁও হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির মিছিলে অংশ নেন। আই.এ ১৯৫৯, বি.এ ১৯৬২, স্যার আশুতোষ কলেজ। এম.এ ১৯৬৭, ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৮ থেকে আমৃত্যু কক্সবাজার কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ছিলেন। কলেজের ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। পাশাপাশি ঈদগাঁও ফরিদ আহমদ কলেজ ও জাহানারা ইসলাম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এবং ঈদগাঁও হাই স্কুলের উন্নয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মৃত্যু: ১৬ মে ১৯৯৫।

শামসুল হুদা ছিদ্দিকী

জন্ম: ২২ মার্চ ১৯৩১, কুতুবদিয়া। পিতা: মাস্টার ছিদ্দিক আহমদ, মাতা: সুফিয়া খাতুন। ম্যাট্রিক ১৯৫২, কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনের ঢেউ লাগে। রাজধানী ঢাকার ছাত্র হত্যার খবর কুতুবদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পৌঁছার পরে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে ও বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এই আন্দোলনে কয়েকজনের সহায়তায় নেতৃত্বও দিয়েছেন ভাষার দাবির মিছিল ও সমাবেশে। ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজে (ওই সময় কক্সবাজার জেলায় কোনো কলেজ ছিলো না)। ওই কলেজে পড়াকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন। পাকিস্তান বিরোধী প্রগতিশীল রাজনীতির জড়িত হয়ে পড়েন তিনি। জড়িয়ে পড়েন ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এ এবং বি.এ ডিগ্রী অর্জন করার পর ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে জড়িত হন।। কক্সবাজার জেলা ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক, পরে সভাপতি হিসেবে। ১৯৬৫ সালের দিকে ন্যাপ ভাসানী ও মোজাফ্ফর নামে দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি ভাসানী ন্যাপের থেকেই যান। ৬৬ এর ৬ দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপ (ভাসানী) পক্ষ থেকে কক্সবাজার মহকুমা সংগ্রাম কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর ন্যাপ (ভাসানী) এর কক্সবাজার মহকুমা সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ন্যাপ (ভাসানী)‘র মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর কাছে পরাজিত হন। ওই নির্বাচনে দেশের প্রায় সবকটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করা হয়।

১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের জাগদলে যোগদেন এবং কক্সবাজার মহকুমা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেন। এ সময় আহ্বায়ক ছিলেন মাহমুদুল করিম চৌধুরী। ১৯৭৯ সালে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য এবং কুতুবদিয়া থানা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে কক্সবাজার জেলা বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আমৃত্যু তিনি কক্সবাজার জেলা বিএনপির সিনিয়র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৯৮১ সালের সামরিক শাসন জারির পর কারারুদ্ধ ও পরে মুক্তি লাভ। রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে তিনি কুতুবদিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বর্তমানে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) ও আমজাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কুতুবদিয়া, কক্সবাজারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেন। মৃত্যু: ১৯ জুলাই ২০০৭।

নুরুল আজিম চৌধুরী

জন্ম: ১৯৩৯, সিকদার পাড়া, মাছুয়াখালী, কক্সবাজার। পিতা: আজম সিকদার
মাতা: আনজুমার আরা বেগম। ম্যাট্রিক ১৯৫৩, ঈদগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়। ঈদগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০ম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন সংঘটিত হয়। ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির মিছিল ও গুলিতে ছাত্র হত্যার খবর খবরটি ঈদগাঁওতে পৌঁছার পরে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে ও বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এই আন্দোলনে নুরুল আজিম চৌধুরী কয়েকজনের সহায়তায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ভাষার দাবির মিছিল ও সমাবেশে। ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। ওই কলেজে পড়াকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন। ওই আন্দোলনে মৌলভী ফরিদ আহমদের একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে বেশিদূর লেখাপড়া এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। মন দেন সমাজসেবায়। তিনি স্বাধীনতার পূর্বে বৃহত্তর জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মৌলভী ফরিদ

আহমদের সাথে পিডিপি করতেন। এবং মৌলভী ফরিদ আহমদের সাথে সব সময় থাকতেন।

স্বাধীনতার পর জোয়ারিয়ানালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এক সময়ের তুখোড় খেলোয়াড় নুরুল আজিম চৌধুরী ঈদগাঁও আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং ওই স্কুলে এস.এস.সি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের নেতৃত্বে কমিটির সভাপতি হিসেবে। এছাড়া কক্সবাজার সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করেন।
মৃত্যু: ১২ এপ্রিল ২০১১

দোহাই

বাংলা গ্রন্থ

১. এম. আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী, ‘চট্টগ্রামী-ভাষাতত্ত্ব’, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লাইব্রেরি।
২. সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ‘বাংলাদেশ’, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২, ঢাকা: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৩. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, ‘সাময়িকপট্রে জীবন ও জনমত’, ১৯৮৩, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
৪. বশীর আল হেলাল, ‘ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
৫. বদরুদ্দীন উমর, ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ।
৬. বদরুদ্দীন উমর, ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৫ চট্টগ্রাম: বইঘর।
৭. বদরুদ্দীন উমর, ‘আমাদের ভাষার লড়াই’, দ্বিতীয় প্রকাশ-মাঘ ১৩৯৫, চট্টগ্রাম: শিশু সাহিত্য বিতান।
৮. নূরুল ইসলাম, ‘সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে’, জুন ১৯৯০, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
৯. বদিউল আলম, মাহবুবুর রহমান, আবদুল হালিম মিয়া ও অন্যান্য সম্পাদিত, ‘কক্সবাজারের ইতিহাস’, ৩০ জুন ১৯৯০, কক্সবাজার: কক্সবাজার ফাউন্ডেশন।
১০. আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক; ‘ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য’, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।
১১. ডা. মাহফুজুর রহমান, ‘বাঙালির জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম’, ২৬ মার্চ ১৯৯৩, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র।
১২. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ‘মুহম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী’, প্রথম খণ্ড, জুন ১৯৯৪, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
১৩. মোহাম্মদ খালেদ সম্পাদিত, ‘হাজার বছরের চট্টগ্রাম’, মার্চ ১৯৯৫, চট্টগ্রাম: কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস।

১৪. ড. মুস্তফা নূর-উল ইসলাম সম্পাদিত, ‘বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে’, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স।
১৫. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ‘পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন’, জানুয়ারি ১৯৯৬, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
১৬. মোস্তফা কামাল, ‘ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন’, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.।
১৭. ড.মোহাম্মদ হাননান, ‘বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১’, জানুয়ারি ১৯৯৯, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
১৮. এম. আর. আখতার মুকুল, ‘ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা’, ডিসেম্বর ১৯৯৯, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী।
১৯. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত ‘ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস’, জুন ২০০০, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
২০. ড.হারুন-অর-রশিদ, ‘বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০’, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০১, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।
২১. ড. রংগলাল সেন, ‘বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী।
২২. শরীফ শমশির, ‘চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলন’, আগস্ট ২০০৩, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
২৩. শেখ তফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত, ‘বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান’, অক্টোবর ২০০৩, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাশে।
২৪. মোহাম্মদ ওবাইদুল হক সঙ্কলিত ‘বংশলতিকা’। নভেম্বর ২০০৪, রামু: চিন্তন প্রকাশন।।
২৫. এম এ বার্নিক, ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস: ঘটনাবহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ’, জানুয়ারি ২০০৫, ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস।
২৬. কামরুদ্দীন আহমদ, ‘স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর’, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা: প্রপদ সাহিত্যঙ্গন।
২৭. ড.অজয় রায়, ‘বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন ১৯৪৭-১৯৭১’, এপ্রিল ২০০৬, ঢাকা: সাহিত্যিকা।
২৮. মালিক সোবহান, ‘কক্সবাজার চরিত কোষ’, জুলাই ২০০৭, কক্সবাজার: কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী।
২৯. ড.মোরশেদ শফিউল হাসান, ‘পূর্ব বাংলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া’, ২০০৭, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।
৩০. সত্যেন সেন, ‘বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা’, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনালয় এর তৃতীয় প্রকাশ-মার্চ ২০১১।

৩১. মোহাম্মদ আলী, ‘ভাষাসংগ্রামী আবদুল মতিন’, জুন ২০১১, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।
৩২. ময়হারুল ইসলাম বাবলা সম্পাদিত, ‘শহীদ সাবেক রচনাসমগ্র’, ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।
৩৩. শহিদুল ইসলাম, ‘একান্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়’, ঢাকা: বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, বইমেলা ২০১৩।
৩৪. বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী, ‘বিচিত্র ভাবনা’, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা: গুল নাহার জাহান আরা ফাউন্ডেশন।

পুস্তিকা

১. অধ্যাপক কাযী আযিযউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম স্মারকগ্রন্থ, সেপ্টেম্বর ১৯৯১, চট্টগ্রাম: প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম গণস্মরণ সভা, কমিটি ও প্রিন্সিপাল আবুল কাসেম স্মৃতি পরিষদ।
২. মো. আবদুল মান্নান সম্পাদিত ‘জেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা: কক্সবাজার’, ডিসেম্বর ২০০৫, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়।

ইংরেজি গ্রন্থ

১. Rangalal Sen, ‘Political Elites In Bangladesh’, UPL-Dhaka, 1986
২. Professor Mustaque Ahmed, *Glimpses of Cox’sBazar*, 1995, Cox’sBazar Foundation.

সংকলন

১. মাজেদ ইবনে এয়ার সম্পাদিত ‘প্রবাল;’ কক্সবাজার সমিতি, চট্টগ্রাম। ১৯৬৯-৭০
২. বদিউল আলম সম্পাদিত ‘কক্সবাজার’। কক্সবাজার জেলা প্রথম বর্ষ উদযাপন কমিটি, কক্সবাজার। ১ মার্চ ১৯৮৫।
৩. মনজুরুল আহসান খান সম্পাদিত ‘আমরা করবো জয়’। ঢাকা। ১৯৯২।
৪. অমিত চৌধুরী সম্পাদিত ‘মূল্যায়ন’। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার। মার্চ ২০০২/ আগস্ট ২০১২সহ বিভিন্ন সংখ্যা।
৫. এস. মোহাম্মদ হোসেন সম্পাদিত ‘সাগর-তীরে’। রম্য প্রকাশন, রামু। ১৫ জুলাই ২০০৭।
৬. সাদাত উল্লাহ খান সম্পাদিত ‘প্রতিবুদ্ধিজীবী’ (ভাষাসৈনিক সংখ্যা)। ঢাকা। সেপ্টেম্বর ২০১০।
৭. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম হেলালী, মনিরুল মনির ও অন্যান্য সম্পাদিত ‘দ্বন্দ্বিক’, শহীদ সাবেক সংখ্যা, বাংলাদেশ লেখক শিবির-চট্টগ্রাম। ৯ ডিসেম্বর ২০১১।

পত্র-পত্রিকা

১. আনন্দবাজার পত্রিকা
২. দৈনিক আজাদ
৩. ইত্তেফাক
৪. দৈনিক সংবাদ
৫. দৈনিক আজাদী
৬. একতা
৭. দৈনিক পূর্বদেশ
৮. দৈনিক পূর্বকোণ
৯. দৈনিক ভোরের কাগজ
১০. দৈনিক সৈকত
১১. দৈনিক কক্সবাজার
১২. দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ
১৩. দৈনিক আজকের দেশবিদেশ
১৪. দৈনিক ইনানী
১৫. দৈনিক কক্সবাজার বাণী